প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র : ১৩৭৮
আগস্ট : ১৯৭১

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় পরিদপ্তর
বাংলা একাডেমী
ঢাকা

মুদ্রণে
বাংলা একাডেমীর
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় পরিদপ্তরের
মুদ্রণ বিভাগ

কালীপ্রসাদ ঘোষ-কে

কয়েকটি কথা

নানান লেখা— এখানে ওখানে— ছোট বড়ো— নামী অনামী পত্রিকায়, দৈনিকে অথবা ষান্মাসিকে— ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। 'আনন্দ পাবলিশার্স'-এর আগ্রহে তাদের কিছু সংকলিত হ'লো। এবং এই সংকলনের খাতিরে প্রতিটি লেখাই মার্জিত ও সংস্কৃত হ'য়েছে, কিন্তু যে-সময়ে যে-পরিপ্রেক্ষিতে লেখা তার ওপরে হস্তক্ষেপ করা হয়নি। আবার এই কাজের মধ্যে দিয়ে দুটি নতুন লেখাও তৈরী হ'য়ে উঠেছে। সব লেখাগুলোই আমার দেখবার এবং জানবার ইচ্ছা থেকে উৎসারিত— এক প্রকার অনুভব করবার চেষ্টা আমার কাজটাকে, আমার দেখাটাকে। লেখাগুলো কবে, কোথায় প্রকাশিত তার একটা হদিশ প্রতিটি লেখার শেষে দেওয়া রইল আগ্রহী পাঠকের জন্য। কিছু কিছু লেখার ক্ষেত্রে কিছু অনুভবও।

প্রকাশক সংস্থার প্রধান আগ্রহ ছিল 'আমার মা' রচনাটিকে ঘিরে। তাঁদের এবং সমস্ত নাট্যানুরাগীদের সম্ভাব্য আগ্রহের কথা মাথায় রেখে, সেটিকে বেশ খানিকটা পরিবর্দ্ধিত করা হ'য়েছে। কিন্তু মানুষের কিছু কথা থাকে একান্তের, গভীরের। তার খানিকটা বলা যায় আর অনেকটা না-বলা থেকে যায়। সংবেদনশীল পাঠক সেই না-বলাটা অনুভব ক'রে নেবেন এটা বোধ ক'রি দুরাশা নয়। এই একই কথা 'জর্জমামা' লেখাটিকে নিয়েও বলা যায়। বিশেষ ক'রে সম্পর্কের মধ্যে যদি সৃষ্টিমূলক কাজ জড়িত থাকে তবে দুটো মানুষের সম্পর্কের যে স্তর গ'ড়ে ওঠে, তার সবক'টি মাত্রা তৃতীয় ব্যক্তির কাছে স্পষ্ট ক'রে তোলা বড় শক্ত। মা এবং মেয়ে, শিক্ষিকা এবং ছাত্রী, নির্দেশিকা এবং সহকারিণী, আবার সহ-অভিনেত্রী— এই এতগুলো সম্পর্কের সবক'টা স্তর প্রকাশ করা কি সম্ভব ?—তেমনিই গুরু-শিষ্যা হ'লে তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক গ'ড়ে উঠতে থাকে প্রত্যেক দিনের শিক্ষা ও চর্চ্চার মধ্যে সে-ও কি প্রকাশ করা সহজ ? তাই এ লেখাদুটি সেই প্রকাশের প্রয়াসমাত্র।

লেখাগুলো সাজানোর সময়ে অনেক সময়ে নতুন লাইনে চ'লে গেছি, আবার একই লেখাতে নতুন প্যারায়। আমার নিজের এমন ক'রে সাজাতে ভালোলেগেছে মূলতঃ প্রসঙ্গের কথা মাথায় রেখে। আবার লেখার ঠাসবুনট থেকে পাঠকের চোখকে একটু মুক্তি দেবার ইচ্ছেটাও বুঝি সঙ্গে ছিল।

বিষয়ের বিভিন্নতার কথা মাথায় রেখে সূচীপত্রেই তা স্পষ্ট ক'রে দেবার চেষ্টা করেছি। হয়তো তাতে পাঠকের কিছু সুবিধা হ'তে পারে।

যাঁরা লেখাগুলি নির্বাচন করতে, এবং লেখা সম্পর্কে মতামত দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। প্রুফ দেখা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজে যাঁরা সাহায্য করেছেন কৃতজ্ঞ তাঁদের প্রতিও। কৃতজ্ঞ শ্রীবাদল বসুর প্রতিও যিনি আন্তরিক হ'য়ে এই বই ছাপাবার দায় গ্রহণ করেছেন—তিনি না বললে এ লেখাগুলো ঐরকমই প'ড়ে থাকত— ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

অ-লেখকের লেখা যদি পাঠকের ভালোলাগে তবেই এই অক্ষম একটা সার্থকতার আভাস অনুভব করবে।

সূচীপত্র

অমল আর আমি

অমল আমার শৈশবের পরিচিত শিশু। কিন্তু অমলকে আমি এখনো ভুলতে পারি না। ঘুরে ফিরেই অমল এসে দাঁড়ায় আমার সামনে, কথা বলে। সে আমার বন্ধু। আমি বড় হ'য়ে গিয়েছি, কিন্তু সে—সে তো শৈশবেই থেমে আছে। সে কবি, সে শিল্পী। সে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল একটি সত্তা। সেই অমলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আমার বছর আষ্টেক বয়সে।
আমি 'ডাকঘর'-এর অমল হ'য়েছিলাম—কিন্তু এই হওয়াটা ঠিক কেমন ক'রে ঘটেছিল সে আর আজ তেমন মনে নেই। মনে থাকা সম্ভবও নয়।
আজকের আমি,—তখনকার আমি—এই দুটোতে কতই তফাৎ!

তখন মহলার সময়ে একটানা বসে থাকতে কত দুঃখ হ'তো। 'ছেলের দলের' ছেলেরা এবং সুধা—সবাই মিলে পাশের ঘরে যখন খেলা করছে, কেকবিস্কুট খাচ্ছে—তখন আমাকে একটা চেয়ারের ওপর মোড়া দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হ'তো। বলা হ'তো—
—'কল্পনা ক'রে নাও তোমার সামনে জানলা, তার সামনে রাস্তা—ঐ ওদিক দিয়ে দইওয়ালা এসে এদিক দিয়ে চ'লে যাচ্ছে। তুমি ডাক।'
আমার বাঁ-দিকে দইওয়ালা আর আমার চোখটা কেবলই ডানদিকে চ'লে যাচ্ছে। কারণ বন্ধুরা ঐদিকের বারান্দায় মাঝে মাঝেই খেলতে খেলতে চ'লে আসছে। আর যেই ওদিকে চোখটা যাচ্ছে অমনি অন্যমনস্কতার জন্য বকুনি খেতে হ'চ্ছে। তারপর, হয়তো—তখন খুব সুস্থসবল আমি—একটা বিছানায় শুয়ে শুয়ে বলছি,
—'দেখ ফকির আজ সকালবেলা থেকে আমার চোখের ওপর থেকে থেকে অন্ধকার হ'য়ে আসছে।'

একদিনের মহলার কথা মনে পড়ে। একদিন, খুব সম্ভব দইওয়ালার সঙ্গের জায়গাতে—যেখানে অমল বলছে,
—'আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হ'য়ে যায় তেমনি ঐ রাস্তার মোড় থেকে, ঐ গাছের সারের মধ্যে দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল আমার মনে হ'চ্ছিল—কী জানি কী মনে হ'চ্ছিল—'

—এই জায়গাটা কিছুতেই আমি পারছিলাম না।
'এদিকে তাকাও—এরকম ক'রে বল—আঃ, চোখটা ঐদিকে যাচ্ছে কেন—আকাশের কথার সময়ে ওপরে উঠবে চোখ—আঃ, রাস্তার মোড় কোনদিকে ? দইওয়ালা কোনদিক থেকে এসেছিল ?'
এইসব অনেক ধমক খাওয়ার পর একবার বোধহয় ঠিক হ'ল। তারপর সেই ঠিকটা আমাকে বোধহয় বারো না তেরোবার বলানো হ'ল। ঘটনাটা এইজন্যে মনে আছে—সেদিন একজন বয়ঃপ্রাপ্ত সভ্য আমার দুর্দশা দেখে ফ্যাক্ ক'রে হেসেছিলেন আর হঠাৎ সেটা দেখতে পেয়ে বুকে যেন তীর বিঁধেছিল ; কান্নায় গলা আটকে গিয়েছিল।

মনে পড়ে প্রথম দৃশ্যে যখন অমল পিসেমশায়কে বলছে সেই বিদেশী লোকটার কথা—বলছে,
—'সেই যেখানে ডুমুর গাছের তলা দিয়ে ঝর্ণা ব'য়ে যাচ্ছে, সেইখানে সে লাঠি নামিয়ে রেখে আস্তে আস্তে ঝর্ণার জলে পা ধুয়ে নিলে। তারপর পুঁটুলি খুলে ছাতু বের ক'রে জল দিয়ে মেখে নিয়ে খেতে লাগলে। খাওয়া হ'য়ে গেলে আবার পুঁটুলি বেঁধে ঘাড়ে করে নিলে। পায়ের কাপড় গুটিয়ে নিয়ে সেই ঝর্ণার ভেতর নেমে জল কেটে কেটে কেমন পার হ'য়ে চলে গেল।'

এই সময়টাতে এবং দ্বিতীয় দৃশ্যেরও অনেকগুলো জায়গায় আমাকে দেয়ালের একটা অংশ দেখিয়ে দেওয়া হ'ত। বলা হ'ত ঠিক ঐ জায়গায় চোখ রেখে পুরো সংলাপটা ব'লে যেতে। পরে বুঝেছি—ঐ জায়গাগুলোতে চোখটাকে দূরে পাঠাবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু একটা আট বছরের মেয়েকে কি ক'রে বোঝানো যেত যে চোখটাকে দূরে পাঠাও, এমন ভাব কর যেদিকে তাকিয়ে আছ সেখানকার কিছু দেখছ না ! তুমি দেখছ অনেক অনেক দূরে—ঐ পাহাড়ের গায়ে একটা ঝর্ণা—তার পাশে ব'সে এক পথিক ছাতু খাচ্ছে !
এরকম অনেক technique বা কৌশল অবলম্বন ক'রেই আমাকে অমল হওয়ানো হ'য়েছিল নিশ্চয়ই। আর তখন, সে-সবের পরে হয়তো কিছু কিছু অনুভব থেকে বেরিয়ে আসত। আমি জানি না। সেসব মনে নেই।
কেবল মনে আছে শেষ দৃশ্যে ব্যবহৃত ফুল অন্যদেয় সঙ্গে কাড়াকাড়ি করার জন্য আমি যখন মঞ্চে ছোটাছুটি করছি অভিনয়ের পরে, তখন অনেক চেনা বা অচেনা বড়রা আমাকে চেপে ধ'রে—'কি ভালো !' 'কি মিষ্টি !' 'অপূর্ব !'—এইসব ব'লে চলেছে।

মহলার সময়ে যখন চুপ ক'রে ব'সে ব'সে সংলাপ বলতে হ'ত, শুয়ে থাকতে হ'ত, বিকেলবেলাগুলোয়—যে সময়টা একমাত্র খেলার সময়—অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য কিংবা অভিব্যক্তি ফোটাতে না পারার জন্য বকুনি খেতে হত, তখন অমলের ওপর যে একটুও বিরক্তি হয়নি একথা জোর দিয়ে বলতে পারি না।
অভিনয়ের শেষে সবাই ঘিরে ধ'রে ভালো বলবার সময়ে ফুল, মালা স—ব

যখন হাতছাড়া হ'য়ে যেত তখনো খুব ভালো লাগত না।
কেবল একবার আমার ইস্কুলের দিদিমণি যখন 'ডাকঘর' দেখার পরে ক্লাসে বলেছিলেন, 'পার্ট তো বেশ মুখস্থ করেছ, পড়া মুখস্থ কর না কেন?'—তখন মনে হ'য়েছিল অমলকে আমি ভালবাসি তো, তাই অমলের কথা আমার মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে আসে—দুলে দুলে চেঁচিয়ে মুখস্থ করতে হয় না তো!
এইসব টুকরো ঘটনা ছাড়া তখনকার ছাপ খুব নেই আমার মনে।

পরে, একটু বড় হ'য়ে, যখন রেডিওতে অমল করতে হ'ল, তখন আমি খুব অসুস্থ থাকতাম। প্রায় সময়ই বিছানায় শুয়ে ব'সে কাটত। তখন মা একদিন রেডিও-তে করতে হবে ব'লে আবার পড়বার জন্য 'ডাকঘর' বইটা আমার বিছানায় দিয়ে গেল। তখন বহুদিন হলো নাটকের সঙ্গে সম্পর্ক নেই প্রায়। বহুদিন নাটকের মহলাই দেখি না। অভিনয় তো করিই না, বহুবছর।
সেদিন 'ডাকঘর' প'ড়ে আমি কেবলই কাঁদতে লাগলাম, গোড়া থেকেই।
অথচ গুণীজনেরা বলেছেন ডাকঘরে 'tear-jerker' কোনো সংলাপ খুঁজে বার করতে পারা যাবে না। realist নাটকের সংলাপের মত সংলাপ নয় এর, এর মধ্যে কবিতা আছে, কাব্য। সেই কবিতা প'ড়ে আমার অমন দশা হ'ল যে কেবলই চোখ ঝাপসা হ'য়ে যায়।
অমলের 'আমি কি ঐ উঠোনটাতেও যেতে পারব না?' যে কি আলোড়ন তুলেছিল আমার মধ্যে! এক একটা সংলাপ পড়ি আর আমার চোখমুখ ভেসে যায়। সে দুপুরটা মনে করলে আমার এখনো কেমন লাগে!
তখন প'ড়ে প'ড়ে আমি যত মনে করবার চেষ্টা করছি যে ছোটবেলায় কি করতাম, এই কথাগুলো কেমন ক'রে বলতাম!—মনে পড়ছে না, কিছু মনে পড়ছে না। আমার মনে হ'চ্ছে এ-সব অনুভব তো এতবার প'ড়ে, এত মুখস্থ ক'রেও তখন কিচ্ছু হয়নি! কিচ্ছু বুঝিনি! কোনো কিছু তো এমন নাড়া দেয়নি! তা হ'লে লোকে তখন আমাকে এত ভালো বলেছিল কেন? কি করেছিলাম? কি ক'রে ভালো হ'ল? কিচ্ছু মনে পড়ল না, আমি এখনো জানি না লোকে কেন ভালো বলেছিল!

পড়তে পড়তে মনে হ'য়েছে মানুষ তো মানুষ—তাই তাকে অজানাকে জানতে হবে, জানতেই হবে, যা পশুপাখির না জানলেও চলে। তাকে ভাবতে হবে, তাকে জানতে হবে, তাকে আবিষ্কার করতে হবে! এটা তার ভেতরের তাগিদ। এটা না ক'রে সে পারবে না। তাই অমল একবার ভাবে দইওয়ালা হবে, একবার ভাবে সময়ের সঙ্গে চ'লে যাবে, একবার ভাবে পথিক হবে। যতদিন খুঁজে না পাওয়া যায় ততদিন সে খুঁজেই বেড়াবে কী তার কাজ। এই ভাবতে ভাবতেই সে ভাবনার একটা কেন্দ্রে পৌঁছয়— সে 'রাজা'-র চিঠি বিলি ক'রে বেড়াবে। এই যে ছটফটানি,—এই যে বাইরেটা দেখবার, পৃথিবীটাকে জানবার একটা অদম্য ইচ্ছে—এসব অনুভব তো রবীন্দ্রনাথের! —'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী···ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে/ বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি/ মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই/ সে কথা যে যাই

পাশরি'—ডানা তো নেই তাই অমল ব'সে কল্পনা করে, কেবলই কল্পনা করে। যা সে দেখতে পায় না, তা সে কল্পনা দিয়ে ভরিয়ে নেয়—
'আমি দেখতে পাচ্ছি রাজার ডাকহরকরা পাহাড়ের ওপর থেকে একলা কেবলই নেমে আসছে। হাতে তার লণ্ঠন, কাঁধে তার চিঠির থলি, কত দিন কত রাত ধ'রে সে একলা কেবলই নেমে আসছে। পাহাড়ের পায়ের কাছে ঝর্ণার পথ যেখানে ফুরিয়েছে সেই বাঁকা নদীর পথ ধ'রে সে কেবলই চ'লে আসছে...' ইত্যাদি।
ঠাকুর্দা তার এই ব্যাকুলতা বোঝে, তাই ঠাকুর্দাও কল্পনার রঙে রাঙিয়ে ক্রৌঞ্চ দ্বীপের গল্প করে অমলের কাছে। বেশি বলতে হয় না। একটু বললে বাকিটা অমল নিজেই কল্পনা ক'রে নেয়। নিজেই বলতে থাকে।

এইবারে পড়ার সময়ে বা অভিনয় করার সময়ে আগের বারের অমল নয়—এক নতুন অমলের অনুভব হ'ল আমার মধ্যে। সে এক অন্য অনুভূতি। বাইরেটাকে জানবার, অনুভব করবার, বুক ভ'রে নিঃশ্বাস নেবার এক দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, যে আকাঙ্ক্ষা অমলের—অমল,—সেই অমল, যার মধ্যে মলিনতা নেই।
আমার মনে হ'ল আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই অমল থাকে—যার দু'চোখে সেই দেখবার আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠলে পাঁচমুড়া পাহাড়, শামলী নদী, গয়লাপাড়ার লাল শাড়ি পরা মেয়ে ধন্য হ'য়ে যায়, সুন্দর হ'য়ে যায়। ঝর্ণার নুড়ি ঠুং ঠাং ক'রে বাজতে বাজতে সঙ্গীতে পরিণত হয়। আমি—আমিও সে—আমার মধ্যেও তা আছে। আমিও 'রাজা'র কাছে ভিক্ষে চাইতে পারি—খঞ্জনি বাজিয়ে 'জয় হোক' ব'লে ভিক্ষে চাইতে পারি! সে ভিক্ষে কি? না তোমার বাণী যেন আমি লণ্ঠন হাতে দেশে দেশে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে পারি!—এর চেয়ে বড় চাওয়া আর কি থাকতে পারে? থাকতে যে পারে না—অমল আমাদের তাই শেখায়। আর তাই অমলকে এত ভালোবাসি। কারণ, অমল সব্বাইকে ভালোবাসে। অমল ভালোবাসতে শেখায়। অমল 'রাজা'র কাছে আমাদের সেই ভিক্ষে চাইতে শেখায় যে ভিক্ষে চাইতে পারলে আর কিছু চাওয়ার থাকে না জীবনে!

সুরঙ্গমা : একটি পরম প্রাপ্তি

'রাজা' নাটকটি ছেলেবেলায় যখন পড়েছি জানি না কেন সুরঙ্গমাকে খুব ভালো লেগেছিল। সুদর্শনার ওপরে হ'য়েছিল রাগ। পরে সুরঙ্গমা যে আমাকে এতটা দেবে তখন তা ভাববার অবকাশও ছিল না। সুরঙ্গমার ভূমিকায় কোনোদিন অভিনয় করতে পাবো এমনটা তখন কেন, আমি যখন করেছি তখনও কারো পক্ষেই কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। আমার পক্ষে তো নয়ই। আমার তখন খুব অল্প বয়স। সবে অভিনয় করতে শুরু করেছি। সেই '৭১-এর মে মাসে বম্বেতে বহুরূপীর নাট্যোৎসবে 'রাজা' করবার কথা হ'চ্ছে, কিন্তু সুরঙ্গমার ভূমিকায় অভিনয় করবার মত তখন কেউ নেই বহুরূপীতে। মা বলল 'শাঁওলী ক'রে দেবে। ও ঠিক পারবে।' বলা বাহুল্য সবাই চমকে উঠেছিল। বাবাও বললে, 'ও কি ক'রে পারবে ? ওকে মানাবে ? ওর বয়স কি ! যে সুরঙ্গমার অমন একটা অতীত আছে—ও কেমন ক'রে— !' মা বললে, 'ও ঠিক পারবে।' বাবা মেনে নিল। কিন্তু মনে বোধহয় খুব ভরসা পায়নি। ভরসা পেয়েছিল পরে। আর তারপরে যতদিন 'রাজা' অভিনীত হ'য়েছে একবার ছাড়া আমিই সুরঙ্গমার ভূমিকায় অভিনয় করেছি, সম্ভবতঃ '৭৮ সাল পর্যন্ত।

'রাজা' নাটকে সুদর্শনার চরিত্র মানুষের একটি সত্তা যা আপনাকে জানবার চেষ্টায় ছটফট করছে। নিবেদনের জায়গা সেই অন্ধকার—তাকে খুঁজে পাবার জন্য, তাকে উপলব্ধি করবার জন্য ব্যাকুল সেই সত্তা। আপন রূপ এবং গুণের গর্বে ভরপুর সে। তাই মাঝে মাঝে তার মনে হয়—এই অন্ধকারকে সে অবজ্ঞা করতে পারে। সমস্ত যুক্তির বাইরে যে অন্ধকারের শক্তি, তাকে তার বুদ্ধি অগ্রাহ্য করতে চায় ; সে ব'লে ওঠে, 'এই অন্ধকারে কেউ নেই, কিছু নেই।' অন্ধকারের মধ্যে যে বীণা সে শুনতে পেয়েছিল, সে 'বিশেষ' বলেই তা শুনতে পেয়েছিল সে, সবাই তো সে পায় না। কিন্তু তাকে সে চিনতে পারলে না। সে যে কোন্ অরূপবীণার ডাক তা তাকে অনুভব করতে হয়েছে পলে পলে, তিলে তিলে, দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে। নাটকের শেষে যে উপলব্ধির স্তরে সে পৌঁছল, বহু সন্দেহ, অবিশ্বাস নিয়ে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক'রে সেই উপলব্ধির স্তরে পৌঁছিয়ে গিয়েছে সুরঙ্গমা— এ নাটকের শুরুতেই। সুরঙ্গমা

হ'লো সুদর্শনার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত একটি চরিত্র। তার গর্ব নেই, অহঙ্কার নেই, অস্থিরতা নেই। দারুণ সঙ্কটেও সেই অন্ধকারের পায়ে নিবেদিতপ্রাণ এ চরিত্র। রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে সুরঙ্গমা সম্পর্কে একটি উল্লেখ আছে—

"Surangama is a simple woman who had gone through her trial and knows that she cannot trust the guidance of her own clinations. She resignedly waits in the solitude of her soul for her king, who can profoundly be realised in the joy of meeting but is never seen."

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বটে 'simple'-কিন্তু কত জটিলতার পথ পার হ'য়ে আজ এই simplicityতে সে পৌঁছিয়েছে— যে simplicity অগভীর সরলতা নয়! এই সরলতার মধ্যে অতল গভীরতা, অতুলনীয় ধৈর্য্য। অনেক মূল্য দিয়ে, অনেক দুঃখ, অনেক কাঁটাবনের পথ পেরিয়ে সুরঙ্গমা আজ এই সুরঙ্গমা।

এই সুরঙ্গমার ভূমিকায় যখন আমাকে অভিনয় করতে হ'লো তখন মা সুদর্শনার অভিনয় করে তো! অস্থির, অল্পবয়সী রূপসী রানী—যে রোম্যান্টিক, যে কেবলই ছটফট করে। সেই তৃপ্তি মিত্রের সুদর্শনার পাশে এই বহুপথ পেরোনো সুরঙ্গমা। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বাবার মনে হ'য়েছিল সুরঙ্গমার ভূমিকায় আমাকে মানাবে কি ক'রে! আমি কি সুরঙ্গমার বোধ, উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা, নিবেদন—এসব দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে পারব? ঐ গান? নর ঐ গান, ঐ বিশ্বাস কি আমার গলার সুরে, গাওয়ার ধরণে প্রকাশ পাবে?

তবু যখন করতে হ'লো তখন সুরঙ্গমার চরিত্র আমাকে ভাবালো। বার বার 'রাজা' নাটক প'ড়ে প'ড়ে আমি সুরঙ্গমাকে অনুভব করতে চাইলাম।

সুরঙ্গমা মেয়েটি যৌবনে, 'নষ্ট মেয়ে' বলতে যা বোঝা যায়, ছিল তাই। শুধু তাই-ই নয়। এই পথটাকে তার ভালো লাগত, তার পক্ষে ও পথটাই স্বাভাবিক ব'লে জেনেছিল সে। ও পথ ছাড়া বাঁচার অন্য কোনো পথ থাকতে পারে এমন ধারণাই তার ছিল না। তার বাবা জুয়ো খেলত, তাদের বাড়ীতে জুয়োর আড্ডা বসত। সেখানে অনেক 'সুন্দর' পুরুষ আসত। মাতৃহীন, স্নেহহীন সংসারে এই ছিল তার জীবনযাত্রা।
এমন সময়ে 'রাজা' তার বাপকে শাস্তি দিলেন, সুরঙ্গমাকে বন্দী করলেন। কোথায়? তা সুরঙ্গমা জানে না। কিন্তু এটা মনে আছে 'রাজা'-র ওপরে তার প্রচণ্ড রাগ হ'য়েছিল। এই হস্তক্ষেপকে তার মনে হ'য়েছিল অবিচার। তাকে যেন 'ছুঁচ ফোটাত', 'আগুনে পোড়াত'। যন্ত্রণায়, রাগে, ক্ষোভে সে ছট্‌ফট্ করত। এই কষ্ট এই গ্লানির মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে তার আজকের সুরঙ্গমায় উত্তরণ। যে সুরঙ্গমা ভক্তিময়ী, যে সুরঙ্গমা জ্ঞানে উপলব্ধিতে পরিপূর্ণা। নিরাভরণা এই মানুষটি আমাদের চোখে অপরূপা হ'য়ে ওঠে। সে 'রাজা'-তে

সমর্পিতপ্রাণা।

নাটক শুরু হ'তেই দেখি—সুদর্শনা আকুল হ'য়ে তাকে বলছে—'এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না ?'
সুরঙ্গমা শান্ত হ'য়ে বলছে,
—'তোমার ঘরে ঘরেই তো আলো জ্বলছে, তার থেকে স'রে আসবার জন্য কি একটা ঘরেও অন্ধকার রাখবে না ?'
সত্যিই তো ! রাজার অস্তিত্ব সেই অন্ধকারের গভীরে, সেখানেই একান্তে তাঁর সঙ্গে মিলন। সে মিলনে অন্য কিছুরই দরকার নেই। তাঁর পায়ের তলার মাটির দিকে তাকালেই মনে হয় নয়ন সার্থক হ'য়ে গেল। অথচ সেই বন্দী অবস্থায়, নিদারুণ কষ্টের সময়ে তার মনে হ'য়েছিল, 'কেউ যদি রাজাকে মেরে ফেলে তো বেশ হয় !'/হ্যাঁ, তাই-ই তার মনে হ'য়েছিল সেদিন ! সে রাজার মৃত্যুকামনা করেছিল ! সুরঙ্গমা বুঝি অস্বীকার করতে চেয়েছিল 'রাজা'-কে এখনকার সুদর্শনার মতন !
কিন্তু আজ সে রাজার অন্ধকারের দাসী। রাজা তাকে এই অন্ধকার ঘর প্রস্তুত করবার ভার দিয়েছেন। সেখানে সে সেই অরূপবীণা শুনতে পায় সর্বদা। তাতেই সে আপনাকে সার্থক মনে করে। সে মনে মনেও বলে না যে আলোর ঘরে আলো জ্বালাবার কাজটি তাকে দেওয়া হোক।
রাজার নির্দেশে সে নিরাভরণা। আবার রাজার নির্দেশেই বসন্তোৎসবে সে সাজে।

বাপের বাড়ী থেকে এসে যখন সে রাজাকে দেখেছিল তখন তাঁকে ভয়ানক মনে হ'য়েছিল। সুদর্শনার যেমন মনে হ'য়েছে প্রথম দর্শনে, সেই আগুনের মধ্যে। ঘৃণায়, ক্রোধে তার সমস্ত সত্তা তখন গর্জে উঠেছিল। কিন্তু এই উত্তরণের ফলে এক দুর্লভ্য বিশ্বাসের অধিকারী হ'য়েছে সে, যা তাকে তার কর্তব্য সম্পর্কে সহজেই সচেতন ক'রে দেয়। রাজা কখন কি চাইছেন তার কাছ থেকে, সে বুঝে নেয় সহজেই। রাজার আগমন সে আপনা থেকেই টের পায়। বলে,
—'মা একটা হাওয়া আসছে।'
সুদর্শনা বুঝতে পারে না। বলে,
—'কোথায় হাওয়া ?'
সুরঙ্গমা সৌরভ অনুভব করে। বলে,
—'গন্ধ পাচ্ছ না ?'
সুদর্শনা তাও পায় না। বলে,
—'না কই, গন্ধ পাচ্ছি নে তো।'
আসলে, সুরঙ্গমার, 'বোঝবার জন্য কিছুই দেখবার দরকার হয় না।' দেখবার দিক থেকে মন ফিরিয়ে যখন অন্ধকারে ডুব দিয়েছে তখনই সে এই 'বোধ'-এর রাজত্বের সন্ধান পেয়েছে।

তাই বুঝি বসন্তোৎসবে রাজার রানীকে দেখা দেওয়ার আশ্বাসে সে খুশী হয় না, শঙ্কিত হয়— 'কৌতূহলের জিনিষ হাজার হাজার আছে। তুমি কি তাদের সঙ্গে মিলে কৌতূহল মেটাবে ! তুমি আমার তেমন রাজা নও ! রানী, তোমার কৌতূহলকে শেষে কেঁদে ফিরে আসতে হবে !'

তেমনি, রাজার কাছ থেকে দূরে স'রে যাবার ডাক যখন আসে সে আপনিই বুঝতে পারে—
—'এই উৎসবের ভেতরে আমার কেবলই মনে হ'চ্ছে রাজা এইবার আমাকে দুঃখ দেবেন। তিনি এবার আমাকে দূরে পাঠিয়ে দেবেন।'
এ কোন্ বোধ ? যে লোক রাজাকে ত্যাগ ক'রে বিপদের পথে এগিয়ে চলল, সেই সুদর্শনার সঙ্গ নেয় সে অনায়াসে, নির্ভয়ে, স্বেচ্ছায়। রাজা তাদের কাউকে কোনো অবস্থাতেই ত্যাগ করবেন না এ বিশ্বাস তার অটুট। তাই দূরে যাবার দুঃখকে বরণ ক'রে নিল সে অনায়াসে, জেনে বুঝেই।

এই পর্য্যন্ত বোধগম্য হ'তে সুরঙ্গমার চলাফেরা, ঘাড় ঘোরানো, মালা গাঁথা সব যেন স্পষ্টই দেখতে পাওয়া গেল। দেখতে সাহায্য করলেন আমার বাবা। সুরঙ্গমা ধীর, স্থির। সে চলে ধীরে, বলে আস্তে (এমন আস্তে নিশ্চয়ই নয় যাতে সংলাপ শোনাতে অসুবিধা হয়, শুধু আস্তে বলছি এই অনুভবটা পৌঁছে দেওয়া), আস্তে চোখ তুলে তাকায়। তার মালা গাঁথার মধ্যে নিবেদনের ভঙ্গীটি।

আমাদের প্রযোজনায় সুরঙ্গমাকে বাবা কালো পোষাক পরিয়েছিলেন। রূপসজ্জায় খানিকটা বয়স্ক-র ছাপ আনার চেষ্টা হ'য়েছিল—মাথার চুলে রূপোলি রেখা স্পষ্ট, মাথায় ঘোমটা ; কপালে, নাকের দু'পাশে বলিরেখা। আর ঐ, কোনো আভরণ নেই। সে যখন প্রত্যয়ের সঙ্গে কোনো কথা বলে তার আওয়াজ চড়ে না, আরো খাদে নেমে যায়। যেমন যখন সে 'রাজা'-র কথা বলতে গিয়ে বলে,
—'সে যেন এইরকম পর্বতের মতই চিরদিন কঠিন থাকে— আমার কান্নায় আমার ভাবনায় সে যেন টলমল না করে।'

সুরঙ্গমার প্রত্যয় কত গভীর ! রাজাকে ত্যাগ ক'রে আসার পর পূর্বদিগন্তে ধূলো উড়ছে দেখে সুদর্শনা রাজার আগমনের আশায় আকুল হ'য়ে ওঠে। সে ত্যাগ ক'রে এলেও রাজাকে সে ভালোবাসে। না বেসে তার উপায় নেই। সুরঙ্গমা কিন্তু জানে এ তার রাজা নয়--
--'আমার রাজা এমন ক'রে ধূলো উড়িয়ে আসে না মা !'

এ দৃশ্যে রানী অভিমানবশতঃ সুবর্ণকেই পরিত্রাতা কল্পনা করে। এখানে আমাদের প্রযোজনায় সুদর্শনা তখন সুবর্ণর কথা মনে ক'রে সাজে, টিপের রঙ বদলায়, উড়নি বদলায়, সুবর্ণর দেওয়া মালা গলায় পরে—আর সুরঙ্গমা

বিস্ফারিত নেত্রে তাই চেয়ে দেখে। হঠাৎ, সুদর্শনা (তৃপ্তি মিত্র, আমার মা) সুরঙ্গমার সেই দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে, সাজ বন্ধ ক'রে চোখ ফিরিয়ে নেয়, সুরঙ্গমাও তখন মুখটা বিপরীত দিকে ফেরায়। এতটা অভিনয় কোনো সংলাপ ছাড়া নিঃশব্দে অভিনীত হ'তো। দর্শকের প্রতিক্রিয়া মঞ্চ থেকে তখনই বুঝতে পারতাম আমরা— এখানে একটা মুহূর্ত তৈরী হ'তো।

এরপরই সুদর্শনা জানতে চায়,
—'সুরঙ্গমা, সুবর্ণকে তুই জানতিস ?'
সুরঙ্গমা জানত। তার বাপের বাড়ীর জুয়ো খেলার দলের সুন্দর পুরুষদের একজন ছিল সুবর্ণ। রানী সে কথা শুনতে চায় না,—
—'না না তোর মুখে আমি তার কোনো পরিচয় শুনতে চাই না। সে আমার বীর, সে আমার পরিত্রাণকর্ত্তা, তার পরিচয় আমি নিজেই পাব।' এই অবিশ্বাস্যকে নিজের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য সে বারবার বলতে থাকে,—
—'সে আমার বীর, সে আমার পরিত্রাণকর্ত্তা—'
তারপর কেঁদে ফেলে।
সুরঙ্গমা এই সমস্ত অনুভবগুলো বোঝে। এই সমস্ত কষ্ট সে পার হ'য়ে এসেছে, সে জানে রাজা যখন কাউকে 'বিশেষ' ব'লে বেছে নেন তখন তাকে এমনই যন্ত্রণা পেতে হয়। সেই সঙ্গে সুরঙ্গমা বেদনার্ত্তও হয় কারণ রানীকে সে ভালোবাসে।
এরপর রানী এসে যখন জিজ্ঞাসা করে,
—'সুরঙ্গমা সত্যি ক'রে বল তো, তুই তোর রাজাকে খুব ভালোবাসিস ?'
সুরঙ্গমা প্রথমে উত্তর দিতে পারে না। রানী যেন আকুল হ'য়ে তার সমস্ত সত্তাকে নাড়া দিয়ে আবার ব'লে ওঠে, 'তুই রাজাকে খুব ভালোবাসিস ?'
সুরঙ্গমা আস্তে গেয়ে ওঠে,
'ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর/ তোমার প্রেম তোমারে এমন ক'রে করেছে নিঠুর/ তুমি ব'সে থাকতে দেবে না যে/ দিবানিশি তাই তো বাজে/ পরাণ মাঝে এমন কঠিন সুর'— গাইতে গাইতে সুরঙ্গমারও কান্নার বাঁধ যেন ভেঙে আসে ! এটা আমাদের 'রাজা' প্রযোজনার আর একটি স্মরণীয় মুহূর্ত।

রানী যখন অরূপ বীণা অনুভব ক'রে আকুল হ'য়ে ওঠে, ক্রমশঃ তার মন যখন রাজার কাছে, তখনও সুরঙ্গমা জানে অনেক পথ বাকি। তাই সুদর্শনা বীণার কথা বলতেই সে বলে,
—'হয়তো কোনো পথিক ছায়ায় ব'সে বিশ্রাম করে আর বাজায় !'
তার ভাবনা —এখনই যেন রানী না মনে ক'রে নেয় সেই বীণা সে শুনতে পেয়েছে মানেই তার যাত্রা শেষ হ'য়েছে, রাজার কাছাকাছি সে পৌঁছে গেছে। সত্যি, তখনও অনেক দুঃখ পাওয়া তার বাকি ছিল।
এই যে, কিছুতেই মনকে ছাড়া দেব না, কেবল অপেক্ষা করব—এই দারুণ সংযমের বাঁধ একবার যেন ট'লে ওঠে, সুরঙ্গমার চোখমুখ অন্যরকম হ'য়ে যায়। সে এই দৃশ্যেই।

সুদর্শনা হতাশ হ'য়ে বলে ওঠে,—'তোর রাজা আমাদের একেবারে ছেড়েই দিয়েছেন। কেনই বা না ছাড়বেন, অপরাধও তো কম করিনি।'
এইখানে সুরঙ্গমার চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে যায়, ঠোঁটের রেখা যায় বেঁকে, সে ব'লে ওঠে,—
—'না মা ছেড়ে তিনি দেননি। ছেড়ে তিনি দিতে পারেন না।'
বলতে গিয়ে তার গলার সুর অন্যরকম হ'য়ে যায়, চাপা উত্তেজনায় খানিকটা কাঁপতে থাকে, —বলে, —
—'... আর যদি ছেড়ে দিতেই পারেন তাহলে তাঁকে আর দরকার নেই, তাহলে তিনি নেই। তাহলে আমার সেই অন্ধকার একেবারে শূন্য—তার মধ্যে থেকে বীণা বাজেনি, কেউ ডাকেনি—সমস্ত বঞ্চনা।'— সে কেঁদে ফেলে। এইখানে সে অন্যরকম। কিন্তু তারপরই সুরঙ্গমা আবার সুরঙ্গমা।

স্বয়ম্বর সভায় আহ্বানে অপমানিতা সুদর্শনা আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত! সুরঙ্গমার নীরব প্রার্থনা বোধ ক'রি রাজার আগমন আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হ'য়ে থাকে, কিন্তু সে বলে না কিছুই। রাজার হ'য়ে কথা বলার শক্তি তো রাজা তাকে দেননি।

এ নাটকে সুরঙ্গমার চরিত্রের কিন্তু কোনো পরিবর্ত্তন নেই। সুদর্শনার পাশাপাশি বিশ্বাসে স্থির, নিবেদনে অটল একটি অচঞ্চল মূর্ত্তি। জুয়ার আসরে পতিতা রমণী থেকে সে যখন 'রাজা'-র অন্ধকার ঘরের দাসীতে রূপান্তরিত তখনই নাটকে তার আবির্ভাব। তার এই উত্তরণের কাহিনী সংলাপের মাধ্যমে চিত্রিত, সেও খুব অল্প কথায়। পুরো নাটকে তার আর কোনো পরিবর্ত্তন নেই। সুদর্শনাকে নিয়েই এই নাটক। সুদর্শনার হাত ধ'রে এই কঠিন পথটি তাকে পার ক'রে দেওয়াই তার একমাত্র কর্ত্তব্য। সেও ছায়ার মতন। সে কখনোই খুব বড় হ'য়ে ওঠে না। কিন্তু এই কাজটির মধ্যেই এই চরিত্রের চরম সার্থকতা। এই চরিত্রের গভীরে ডুব দিয়ে যেন তল পাওয়া যায় না। সুরঙ্গমার স্তরকে ছুঁতে গিয়ে নিজে উন্নীত হ'ই, নিজে যেন সেই অরূপকে কোথাও ছুঁতে পারি যেটা 'শাঁওলী' হ'য়ে পারি না। এখানেই সুরঙ্গমার চরিত্রচিত্রায়ণের কাজে আমার পরম পাওয়া। আমি যেন ধনী হ'য়ে উঠি। নাটকের প্রায় শেষে এসে যখন গান গেয়ে উঠতাম—

"ভোর হল বিভাবরী
পথ হল অবসান—"

তখনই মনে হ'তো এই পথ আবার শুরু হোক— এক্ষুনি। আমি আবার একবার ওই গভীরে, ওই গভীর অনুভবের সাগরে ডুব দিয়ে মুক্তো ছুঁতে চেষ্টা করি।

[অধুনালুপ্ত একটি লিট্‌ল্‌ ম্যাগাজিন 'চেনামুখ' পত্রিকায় '৮০-র সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত হ'য়েছিল এ লেখাটি। কিশোর—তখন কিশোরও নয়, প্রায় বালক শুভকুমার বসুর একক প্রচেষ্টায় এ পত্রিকা প্রকাশিত হ'তো। ক্রমশঃ 'চেনামুখ' তার আপন স্থান অর্জন ক'রে নিচ্ছিল। শুভ-রই অনুরোধে এই লেখাটি রচিত হয়—বিষয়টির বীজ-ও তারই মন থেকে উৎসারিত। মাত্র উনিশ বছর বয়সে শুভ-র চ'লে যাওয়া আমাদের আজীবন বহন করবার মত বেদনা।]

রবীন্দ্রনাটক 'ডাকঘর' নিয়ে ভাবনার খেলা

রবীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ নাটকেই নির্দেশনার অংশ বড় কম। অর্থাৎ পাত্রপাত্রীর 'প্রবেশ' 'প্রস্থান' ছাড়া অন্য কোনো নির্দেশ (এমন কি কোনো কোনো স্থানে 'প্রস্থান'টিও বুঝে নিতে হয়!) নাটককারের কাছ থেকে আমরা প্রায় পাই না—পেলেও যৎসামান্য। চরিত্রগুলোর মধ্যে কেউ ভয় পেল, কি কারো কান্না পেল, কেউ উঠে দাঁড়াল কি বসল—এ সমস্তটাই সংলাপ প'ড়ে নিজের অনুভবের মধ্যে দিয়ে নিজে কল্পনা ক'রে নেওয়া। এটা প্রায় একটা খেলার মত দাঁড়িয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বহু নাটককারই কিন্তু তাঁদের নাটকে নির্দেশনা লিখেছেন। যেমন— Galsworthy, S. M. Barri, Chekov ইত্যাদি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী নির্দেশনা আছে বোধহয় Bernard Shaw-এর নাটকে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কি দীনবন্ধু কি গিরিশবাবুর নাটকেও ব্র্যাকেটে নির্দেশনার অংশ কিছু কম নয়। যেখানে সমসাময়িক এবং পূর্বসূরীরা (Shakespeare ছাড়া) এই ধরণে নাটক লিখেছেন সেখানে রবীন্দ্রনাথের রচনা একেবারেই অন্য ধাতের। তিনি অনেকটা দায় আমাদের ওপরে চাপিয়েছেন। আমাদের কেবলই খুঁজে বার করতে হয়, কল্পনা করতে হয়, ভাবতে হয়। আর তারপর মন দিয়ে পড়তে পড়তে দেখি নাটকের সংলাপের মধ্যেই আমাদের সাহায্য করবার উপকরণ র'য়েছে।

'ডাকঘর' নাটককে ভিত্তি ক'রে তার কিছু কিছু অংশ নিয়ে এই নির্দেশনা বোঝবার খেলায় বা সংলাপ বলার ভঙ্গী বোঝবার খেলায় কিছুক্ষণ বসা যাক। প্রথমে নেওয়া যাক প্রথমদৃশ্যের সেই অংশটা যেখানে প্রথমবার অমলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'চ্ছে।—

অমলগুপ্তের প্রবেশ

অমল

পিসেমশায়!

মাধবদত্ত
কী অমল

অমল
আমি ওই উঠোনটাতেও যেতে পারব না ?

মাধবদত্ত
না বাবা

অমল
ওই যেখানটাতে পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন, ওই দেখো-না যেখানে ভাঙা ডালের খুদগুলি দুই হাতে তুলে নিয়ে লেজের উপর ভর দিয়ে ব'সে কাঠবিড়ালী কুটুস্ কুটুস্ ক'রে খাচ্ছে—ওখানে আমি যেতে পাবব না ?

মাধবদত্ত
না বাবা

এখানে আমরা দেখছি কতগুলো সংলাপ—কোনো গূঢ় তত্ত্ব নিয়ে আলাপ আলোচনা নয়—একটি ছোট ছেলের বাইবে বেরোবার ইচ্ছে আর তার অভিভাবক তাকে বেরোতে দেবেন না (যেমনটি প্রত্যেক মানুষের ছেলেবেলাতেই বোধহয় ঘটে থাকে) —এই নিয়ে কয়েকটি সংলাপ। দেখা যাচ্ছে 'অমলগুপ্তের প্রবেশ' কথাটি ছাড়া নাটককার কোনো নির্দেশ দেননি—কিভাবে কোথায় দাঁড়াতে হবে, ব'সে কথা কইতে হবে না দাঁড়িয়ে, হাসতে হবে না গম্ভীর হ'তে হবে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে খনিজের মত লুকিয়ে আছে এসব নির্দেশ। Geology তে মাটির স্তর দেখে যেমন কল্পনা করতে হয় খনির বিবরণ তেমনি সংলাপ প'ড়ে প'ড়ে অনুভব ক'রে অবস্থাটা কল্পনা ক'রে বার ক'রে আনতে হয় সেই সব নির্দেশ। যেমন এ নাটকের একেবারে গোড়ায় কবিরাজের সঙ্গে কথায় প্রকাশ পায় ছেলেটি অসুস্থ, সে অসুখ সারবার খুব আশা নেই। ঠাকুরদার সঙ্গে মাধবদত্তের সংলাপে আরো প্রকাশ পায় ছেলেটি মাধবদত্তের গ্রামসম্পর্কে ভাইপো, অনাথ এবং অসুস্থ। অসুখের সব যন্ত্রণা সে মুখ বুজে সহ্য করে। এসব শুনে শুনে আমাদের মন খানিকটা তৈরী হয়ে আছে, আমাদের মন সমবেদনায় ভরপুর অমলের জন্য। তখন অমল এসে ডাক দেয়—'পিসেমশাই!' অন্দরের দিকের দরজাটির কাছে দাঁড়িয়ে দরজায় হাত রেখে—সে উঠোনে যাবার অনুমতি চাইতে এসেছে। মাধবদত্ত বলেন,—'কী অমল ?'—নিশ্চয়ই খুব স্নেহমাখা কণ্ঠে। একটু আগেই তো আমরা দেখেছি তিনি ঠাকুরদাকে বলছেন—'এই ছেলেটিকে যে আমার কিরকম লেগে গিয়েছে—'। কবিরাজ এবং ঠাকুরদার সঙ্গে সংলাপে অনেকবারই প্রকাশ পেয়েছে ছেলেটি মাধবদত্তের বড় প্রিয়। তাই তিনি খুব স্নেহের স্বরেই বললেন—'কী অমল ?' অমল জিজ্ঞেস করে, 'আমি কি ওই উঠোনটাতেও

যেতে পারব না ?' বলতে বলতে সে আঙুল দেখায়। এই তো—দরজাটা পেরিয়ে যে খোলা জায়গাটা, অন্দরের মধ্যে, বাইরে কোথাও নয়, কারণ পিসিমা তো ওইখানেই ব'সে জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন! পিসেমশায় বলে— 'না বাবা।' বলতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয় যে না, ঐ ঘরোয়া উঠোনটুকুতেও তুমি যাবে না। দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বলেন, 'না বাবা।' অমলের বিশ্বাস হয় না। বোধহয় পিসেমশায় ঠিক বুঝতে পারেননি ও কোথায় যেতে চায়। তাই ব্যাখ্যা ক'রে বলে, 'ওই যেখানটাতে পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন' ব'লে বোধহয় অসুস্থ শরীরে যতটা তাড়াতাড়ি হাঁটিতে পারে ততটা তাড়াতাড়ি পিসেমশায়ের দিকে এগিয়ে আসে, তাঁর মুখটা উঠোনের দিকে ঘুরিয়ে দিতে দিতে বলে—'ওই দেখ-না—' তারপব নিজেই মুগ্ধ হ'য়ে যেতে যেতে বলে,— 'যেখানে ভাঙা ডালেব খুদগুলি দুই হাতে তুলে নিয়ে লেজের ওপর ভর দিয়ে ব'সে কাঠবিড়ালী কুটুস কুটুস ক'রে খাচ্ছে—' ডুবে গিয়েছিল অমল দেখতে দেখতে, মজা পাচ্ছিল কাঠবিড়ালীর খাওয়া দেখতে, হঠাৎ চমক ভেঙে বলে, —'ওখানে আমি যেতে পারব না ?' পিসেমশায়ের নিশ্চয়ই আরো কষ্ট হয়। তবু তিনি স্বাভাবিক হ'য়ে বলার চেষ্টা করেন, 'না বাবা।' অমল যেন একটা নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর হতাশভাবে চৌকিতে ব'সে পড়ে। আপনমনে বলে— 'আমি যদি কাঠবিড়ালী হ'তুম তবে বেশ হ'তো!' অর্থাৎ তাহলে তো আমার এই বাধাটা মানতে হ'তো না! তারপর যেন অস্থির হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কিন্তু পিসেমশাই আমাকে কেন বেরোতে দেবে না ?' কেন ? কেন ? কি হয় বেরোলে ? অমল বেরিয়ে পড়তে চায়। ঘরে ব'সে পুঁথি প'ড়ে পণ্ডিত হবার কোনো সাধ নেই : স্বপ্নে, কল্পনায়,—কোথাও, কোথাও সে পণ্ডিত হওয়াকে মূল্য দিতে পারে না। সে কক্‌খনো পণ্ডিত হবে না। তাব খালি বেরিয়ে পড়বাব সাধ। সে ঘুরে ঘুবে দই বেচতে পাবে, প্রহরী হ'য়ে ঘন্টা বাজাতে পাবে, একজন খঞ্জকে চাকার গাড়িতে ঠেলে ঠেলে ভিক্ষে চেয়ে বেড়াতে পারে, সে ডাকহরকরা হ'তে পারে, সে তার সবচেয়ে বড় সাধ! কিন্তু পণ্ডিত ? নৈব নৈব চ। আব এই যে তার বার বার ঘর ছেড়ে দূরে চ'লে যেতে চাওয়া—পিসেমশায়কে তা পীড়িত করে। তাঁর মন খারাপ হ'য়ে যায়। তিনি বুক দিয়ে ওকে আগলাতে চান।

পিসেমশায়ের এই অস্থির হওয়া, বাইরে যাওয়া ভালো নয় এটা নানারকম ভাবে অমলকে বোঝানোর চেষ্টা এবং অমলের দিকে ভালোবেসে তাকানো আমাদের মনে গেঁথে আছে যখন, ঠিক সেই সময়ে এই দৃশ্যের শেষটা আমাদের খুব নাড়া দেয়।

মাধবদত্ত বলেন অমল যেন জানালায় ব'সে ব'সে যে-সে বিদেশী লোককে ডেকে ডেকে কথা না বলে। অমল বলে, 'বিদেশী লোক আমার ভারী ভালো লাগে।' এইটুকু কথার মধ্যে বেশ কয়েকটা ভাবের খেলা।—

(১) বিদেশী লোক আবার কি ক্ষতি করবে ?

(২) বিদেশী লোকই তো আমার এই গণ্ডীর বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে

যোগাযোগের মাধ্যম।

(৩) তাছাড়া তাদের যে আমার ভীষণ ভালো লাগে। তারা সবাই যে আমার সঙ্গে কত ভালোবেসে কথা ব'লে যায়!

(৪) বেরোই তো না, এটুকু যোগ না রাখলে বাঁচি কি ক'রে?

পিসেমশাই তাড়াতাড়ি বাস্তব কথা বলেন,—'যদি তোমাকে ধ'রে নিয়ে যেত!' অমল খুব করুণ গলায় বলে,—'তাহলে তো সে বেশ হ'ত, কিন্তু আমাকে তো কেউ ধ'রে নিয়ে যায় না—সব্বাই কেবল বসিয়ে রেখে দেয়।'

অনুমান করা যায়—তাহলে তো সে বেশ হ'ত বলতে বলতে হয়তো তার মুখ উজ্জ্বল হয়—বোধহয় এই ধ'রে নিয়ে যাবার সূত্রে বাইরে, এই চারদেয়ালের বাইরে বেরোনোটা কল্পনা ক'রে,— আর তারপরই—'আমাকে তো কেউ ...' — তার প্রায় কান্না পেয়ে যায়, সঙ্গে আমাদেরও, মাধবদত্তেরও। নইলে কি এই কথার পরেই চট ক'রে তিনি বলতে পারেন, 'আমার কাজ আছে আমি চললুম...' ইত্যাদি? আমরা বুঝতে পারি কান্নাটা চাপাতে তিনি দরজার দিকে পা বাড়িয়েছিলেন, কোনোমতে বলেছিলেন, 'আমার কাজ আছে আমি চললুম।'— তারপর, একটু থেমে, অমলের কাছে ফিরে এসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, 'কিন্তু বাবা, দেখো, বাইরে যেন বেরিয়ে যেও না।' অমল তার উত্তরে বলে,

'যাব না। কিন্তু পিসেমশাই, রাস্তার ধারের এই ঘরটিতে আমি ব'সে থাকব।'

এই আকুতি দেখে পিসেমশাই বোধহয় আর নিজেকে সামলাতে পারেন না—কোনোরকমে অমলের মাথায় হাত বুলিয়ে চ'লে যান। তাই বুঝি কোনো সংলাপ আর লেখা নেই—দৃশ্যটি এইখানেই শেষ।

এইবারে দ্বিতীয় দৃশ্যের শুরু। এই শুরুটা বড় কাব্যময়। লেখা আছে এইরকম—

দ্বিতীয় দৃশ্য

দইওয়ালা

দই—দই—ভালো দই।

অমল

দইওয়ালা, দইওয়ালা, ও দইওয়ালা!

দইওয়ালা

ডাকছ কেন? দই কিনবে?

অমল

কেমন ক'রে কিনব ? আমার তো পয়সা নেই।

দইওয়ালা

কেমন ছেলে তুমি ! কিনবে না তো আমার বেলা বইয়ে দাও কেন ?

অমল

আমি যদি তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারতুম তো যেতুম।

দইওয়ালা

আমার সঙ্গে ?

অমল

হাঁ। তুমি যে কতদূর থেকে হাঁকতে হাঁকতে চলে যাচ্ছ, শুনে আমার মন কেমন করছে।

দইওয়ালা

(দধির বাঁক নামাইয়া)

বাবা, তুমি এখানে বসে কী করছ ?

অমল

কবিরাজ আমাকে বেরোতে বারণ করেছে তাই আমি সারাদিন এইখানেই ব'সে থাকি।

দইওয়ালা

আহা, বাছা তোমার কি হয়েছে ?

... ইত্যাদি

এইপর্যন্তই একটু আলোচনা করা যাক। এইটুকুর মধ্যেই অজস্র আবেগের মণিমুক্তো লুকোনো আছে। শুধু আবেগই নয়, মঞ্চে অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু নির্দেশও। প্রথমেই ভাবা যাক অমল কোত্থেকে ডাকছে দইওয়ালাকে। এর জন্য আমাদের প্রথম দৃশ্যের সাহায্য নিতে হবে। রাস্তার ধারের ঘরটির হয় দরজার সামনে, নয় জানালার ওপরে অমল ব'সে আছে। প্রেক্ষাগৃহের দিকে মুখ ক'রে। মঞ্চের সামনের অংশটা নিশ্চয়ই রাস্তা। এইসময়ে পর্দা উঠল কিংবা আলো জ্বলল। লেখা আছে— দই-দই-ভালো দই। কিন্তু দইওয়ালা কি শুধু একবারই হাঁকটা দিয়েছিল ? অমল ব'সে, আর দূর থেকে দইওয়ালার হাঁকটা ভেসে আসে, তাকে দেখা যায় না—তারপর ক্রমশঃ ডাকটা এগিয়ে আসতে থাকে, আর অমল আমরা দেখতে পাই ঐ হাঁক শুনে সচকিত হ'য়ে ওঠে, ঘাড় বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করে—নিশ্চয়ই এইরকমই হবে এই নাট্যে। কারণ অমল যে বলছে 'তুমি যে কতদূর থেকে হাঁকতে হাঁকতে চ'লে যাচ্ছ...'— ডাকতে ডাকতে দইওয়ালা অমলের কাছাকাছি এসে

পড়েছে কিন্তু সে নিশ্চয়ই অমলের দরজা বা জানালার সামনাসামনি আসেনি। অন্যদিক দিয়ে চ'লেই যাচ্ছিল। তা না হ'লে অমলকে বলতে হ'তো না—'দইওয়ালা—দইওয়ালা—' এবং আরো জোর দিয়ে 'ও দইওয়ালা।'
দইওয়ালা তখন ঘুরে দেখলে একটা বাচ্ছা ছেলে জানালায় ব'সে তাকে ডাকছে। দুষ্টুমি ক'রে ডাকছে! নাকি সত্যিই কিনবে. বড়রা কেউ ডাকতে বলেছে! এইরকম একটা মন নিয়ে দইওয়ালা দু-পা এগিয়ে আসে, বিক্রীর আশায় তার মুখখানিতে হয়তো একটু আলোর আভাস। সে বলে,
'—ডাকছ কেন? দই কিনবে?'
অমল অপ্রস্তুত হয়। তার যে দইওয়ালার হাঁক শুনে খুব মন কেমন করছিল, তাই তো ডেকে ফেলেছে! দইওয়ালা বলে,
—'কেমন ছেলে তুমি। কিনবে না তো আমার বেলা বইয়ে দাও কেন?'
রাগ ক'রে সে বোধহয় যাবার পথেই পা বাড়াচ্ছিল। একে তো অমলের একা ব'সে দিন কাটে না। তায় এ লোকটা রাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছে। অমল সইতে পারে না। তাড়াতাড়ি বলে—' 'আমি যদি তোমার সঙ্গে চ'লে যেতে পারতুম তো যেতুম।' এর একটা ভাব হ'লো— শুধু শুধু তোমার সময় নষ্ট আমি করিনি, এই কথাটা আমার তোমাকে বলার ছিল!
দইওয়ালা ভীষণ অবাক হ'য়ে বলে, 'আমার সঙ্গে!' কি বলে রে ছেলেটা! অমল জোর দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ!' শুধু 'হাঁ' নয়, হ্যাঁ হ্যাঁ—'তোমার সঙ্গে— সেই তুমি যে 'তুমি কত দূর থেকে হাঁকতে হাঁকতে চ'লে যাচ্ছ, (গলা নামিয়ে) শুনে আমার মন কেমন করছে!' বড় আকুল হয় যে সে মনে মনে। সেই আকুলতা দইওয়ালাকে ছোঁয়। ছোট ছেলেটির চোখদুটো দেখে তার মায়া হয়, সে এবার বদলায়। আহা, তারই হাঁক শুনে এই শীর্ণ ছোট্ট ছেলেটির মায়ায়ভরা চোখ দুটো অমন উতল হ'য়ে উঠেছে! তার এতখানি পরিবর্তন সব ঐ একটা নির্দেশে প্রকাশিত—'দধির বাঁক নামাইয়া'। দইওয়ালার মনে হয় এ তো সাধারণ ছেলে নয়, সাধারণ কোনো ছেলে তো এমন কথা বলে না। এ ছেলে চেঁচামেচি করতে পারত, বাড়ীর বড়দের ডেকে দই খাবার বায়না ধরতে পারত,— সেসব তো এ করছে না। কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করে— 'বাবা, তুমি এখানে বসে কী করছ?' অমল কবিরাজের মানা-র কথা বলে। কি অসহায় লাগে ওকে! কিন্তু আত্মকরুণার ছায়া অমলের বলার ভঙ্গীতে থাকে না। এই নির্দেশও আমরা বুঝে নিতে পারি নাটকটা প'ড়ে! অমল নিজের অসুখের কথা, কষ্টের কথা আলোচনা করে না কখনোই, কথা উঠলে অন্য কথা পাড়ে। দইওয়ালাও যখন জিজ্ঞাসা করে, উদ্বেগে পরিপূর্ণ হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে, —'আহা বাছা তোমার কী হয়েছে?' অমল দায়সারা উত্তর দিয়ে দ্রুত অন্য প্রসঙ্গে চ'লে আসে। এইরকমই মনে হয় পড়লে।

দইওয়ালার সঙ্গে কত গল্পই হয় তার! শেষকালে সে দইওয়ালাকে ঐ 'দই দই' হাঁকটা তাকে শিখিয়ে দিতে বলে। দইওয়ালা বুঝতে পারে না তার হাঁকের সুরে শেখবার মত কি থাকতে পারে! কিন্তু তার বুকের মধ্যে বোধ করি তখনই দম-ধরা আবেগ। সেই আবেগ ক্রমশঃই বাড়ে যখন অমল ব্যাকুল হ'য়ে বলে,

'না না, ও আমার শুনতে খুব ভালো লাগে।' তার কচি মন যে উথাল পাথাল করে। অমল বলে, চোখের কোণ দিয়ে আকাশটাকে দেখতে দেখতে বলে, 'আকাশের খুব শেষ থেকে যেমন পাখির ডাক শুনলে মন উদাস হয়ে যায়—' ('উদাস হ'য়ে যায়' বলতে বলতে বুঝি তার চোখ অল্প বুজে আসে, তারপরই রাস্তার দিকে ইঙ্গিত ক'রে বলতে থাকে—) 'তেমনি ওই রাস্তার মোড় থেকে, ওই গাছের সারের মধ্যে দিয়ে যখন তোমার ডাক আসছিল আমার মনে হ'চ্ছিল—' বলতে বলতে কেমন আবেগে উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপে যেন অমল—কিন্তু কি যে তার মনে হ'চ্ছিল তা সে ভাষায় বোঝাতে পারে না। দইওয়ালার দিকে তাকিয়ে দেখে দইওয়ালার মুখটা কেমন হ'য়ে গেছে শুনতে শুনতে, ঠোঁটটা ফাঁক, সজল আবেগ অনুভব ক'রে সে যেন এক পরম পাওয়া পাচ্ছে— ! অমল একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে অল্প হাসে, তারপর বলে—'কী জানি কী মনে হ'চ্ছিল !' দইওয়ালা খানিকক্ষণ কিছু বলতে পারে না, তারপর ধীরে ধীরে কোনোরকমে বাঁক থেকে এক ভাঁড় দই বার ক'রে বলে 'এক ভাঁড় দই তুমি খাও'। —গলাটা বুঝি একটু কেঁপে যায় তার। অমল হাত দুটি নিশ্চয়ই পেছনে লুকোয়,—
'আমার তো পয়সা নেই।' দইওয়ালা আবেগে ব'লে ওঠে,—'না না না না'— কি প্রবলভাবে বলে, যেন অমল পয়সার কথা মুখে উচ্চারণ ক'রে ফেললেও দইওয়ালার পক্ষে তা ঠিক হবে না। বলে, 'পয়সার কথা বোলো না !' অমল তো জানে না আজ দইওয়ালাকে সে কি দিয়েছে ! আবেগ সামলাতে সামলাতে বলে, 'তুমি আমার দই একটু খেলে আমি কত খুশি হব !' অমলের দইটা নিতে নিতে বুঝি মনে প'ড়ে যায়—'কিনবে না তো আমার বেলা বইয়ে দাও কেন !' লজ্জা পায় অমল, ' দইওয়ালা তোমার কী অনেক দেবী হ'য়ে গেল ?' দইওয়ালা তাড়াতাড়ি বলে, 'কিচ্ছু দেরী হয়নি বাবা, আমার কোনো লোকসান হয়নি।' থেমে যায় সে, গলার আওয়াজ নেমে যায় খাদে— 'দই বেচতে যে কত সুখ সে তোমার কাছে শিখে নিলুম।'—কথাটা আসলে বোধহয় সে নিজেকেই বলে। তার কাজেরও একটা মানে আছে, উদ্দেশ্য আছে, তার হাঁক একটা অসুস্থ ছোট ছেলের মনকে আকুল করে—এসব তাকে কোন এক আবেগের মধ্যে নিয়ে গেছে, তাই বোধহয় আর সে কিচ্ছু বলে না, বিদায়টুকুও চায় না। লেখা আছে 'প্রস্থান', যাবার আগে হয়তো জামার হাতায় কি গামছার কোণায় চোখের কোলটা একটু মুছে নিয়েছে সে। সে চলতে থাকে। একটু পরে সে কি আবার হাঁকতে শুরু করেছিল, 'দই—দই—ভালো দই' ? অমল হয়তো তারই সঙ্গে গলা মেলাচ্ছিল। আবার এমনও হতে পারে যে দইওয়ালার আবেগ তাকে তক্ষুনি তার নিত্যকার কাজের মাঝে ফিরে যেতে দেয়নি। কেবল বাঁকের আওয়াজ হ'চ্ছিল। সে আওয়াজ ক্রমশঃ মিলিয়ে যাচ্ছিল, আর সেই শুনতে শুনতে আমাদের সামনে ব'সে প্রাণপণে ঐ হাঁকের সুরটা গলায় তোলবার চেষ্টা করছিল অমল—

'দই—দই—ভালো দই' !!

নাটকের প্রতিটি অংশ নিয়েই এইভাবে ভাবনার খেলা করা যায়। তাতে

লেখাটির আয়তন বিপুল হ'য়ে উঠবে। তাই একটু এগিয়ে যাই। চ'লে যাই নাটকের শেষ দৃশ্যের শেষ অংশে।

কেবল, তার আগে একটু মনে ক'রে নিই যে এই দইওয়ালা প্রত্যহ অমলের জন্য এক ভাঁড় দই রেখে যেত এর পর থেকে, তার নিবেদন। মনে ক'রে নিই দ্বিতীয়দৃশ্যে প্রহরীকে ডেকে গল্প করবার সময়ে অমল ডাকঘর এবং ডাকহরকরার কাজকে ভালোবেসে ফেলে। রাজার কাছ থেকে ছোট্ট একটি চিঠি পাবার আশায় সে তখন দিন গোণে ; আর ভাবে একদিন সে নিজে ডাকহরকরা হ'য়ে রাজার চিঠি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবে, সেইটাই সবার বড় কাজ।

মোড়ল এসে তাকে ভর্ৎসনা করে। একটা অত্যন্ত সাধারণ ঘরের ছেলে হ'য়ে সে কি না আশা করে রাজার কাছ থেকে সে চিঠি পাবে ! দইওয়ালা, প্রহরী, সেই বিদেশী লোক, সেই খঞ্জ—সবার থেকে এ মোড়ল আলাদা। লোকটা নিষ্ঠুর। তার মনের অনেক জটিলতা, ক্ষতিকারক মনোভাব কচি অমলের বোধগম্য হয় না। সে খালি বোঝে এই মোড়ল মশাই তার বন্ধু হ'লো না।

আর সুধা—সুধা তাকে ফুল দিয়ে যাবে এই সময় থেকে এ-ও অমলের আর এক প্রতীক্ষা। সুধা বলেছে—'আসব।' বলেছে, 'ঠিক মনে থাকবে।' তাই সুধার প্রতীক্ষা করে অমল মনে মনে। সে অমনি অমনি ফুল নেবে না, সে যখন কাজ খুঁজতে চ'লে যাবে পাহাড়টা পার হ'য়ে তখন নিশ্চয়ই সে সুধার ফুলের দাম দিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই দিয়ে যাবে।

এরপর ছেলের দলের খেলা দেখতে দেখতে অসুস্থ অমল ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমে জুড়ে আসা চোখদুটো নিয়ে সে ছেলের দলকে বলে তারা যেন 'শরৎ-হরকরা', 'বাদল-হরকরা'-দের অমলের কথা ব'লে দেয়। যখন সব ছেলেরা হৈ হৈ ক'রে মাঠে খেলতে চ'লে যায় তখন ক্লান্ত অমল জানালার পাশে ঘুমোয়। দ্বিতীয় দৃশ্যের এই শেষটিতে অনিবার্য ভাবে যে গানটি মনে পড়ে তা হ'লো—

'আমি চঞ্চল হে, সুদূরের পিয়াসী...
মোর ডানা নাই আছি এক ঠাঁই
সে কথা যে যাই পাশরি।'

অথচ অমল হয়তো স্বপ্নে তখন সেই তার 'রাজা'-র দেশে ভিক্ষে চাইতে গেছে ! আমরা কি জানি কেউ ?

তৃতীয় দৃশ্যের শুরুতে বুঝতে পারি অমল একেবারে শয্যাশায়ী। পিসেমশায় তার কাছটিতে ব'সে। অমল কিন্তু বাইরের জগৎ সম্পর্কে সমান অধীর।

এই সময়ে গ্রামের সবার ঠাকুরদা, যাঁকে আমরা প্রথম দৃশ্যে মাধবদত্তের সঙ্গে

কথা বলতে দেখেছি, অমলের কাছে এসে উপস্থিত হন। মাধবদত্ত জানেন না যে তাঁর অগোচরে ঠাকুরদা প্রায় রোজই অমলের কাছে আসেন, ফকিরের ছদ্মবেশে। এ সবই আমরা সেই কথোপকথন থেকে বুঝতে পারি। অমলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এক অন্য স্তরের তাও বুঝতে পারি। বুঝি এ এক গভীর সম্পর্ক—যেখানে অমল ডাকহরকরা হওয়ার স্বপ্নের কথা, তার রাজার চিঠির জন্য অপেক্ষা করার কথা, তার রাজার দরজায় ভিক্ষে চাইতে যাওয়ার ইচ্ছের কথা—এ সবই অকপটে বলতে পারে। শুনতে শুনতে ঠাকুরদার চোখ সজল হ'য়ে ওঠে। আর এই ছোট্ট মানুষটিকে খুশী করতে ঠাকুরদা তাকে কতরকম দেশের গল্প বলে। অমল চোখ বড় বড় ক'রে সব শোনে। সে কত দেশের গপ্পো—হয়তো ভূগোলের মানচিত্রে সেসব দেশের নাম পাওয়া যাবে না, তাই ব'লে তার মধ্যে সত্য নেই তা নয়। এক দ্বীপ যেখানে কেবল পাখীরাই থাকে, তারা গান গায় আর ওড়ে, আর কোনো কাজ করে না ওরা। অমলের বড় বড় চোখগুলো কোন দূরে ভেসে যেতে থাকে—বা বেশ মজা তো!—বলে, '—আমি যদি পাখী হতুম তাহলে—'

এই দৃশ্যের একেবারে শেষাংশে কিন্তু দেখি রবীন্দ্রনাথ অনেক নির্দেশ দিয়েছেন—'চমকিয়া উঠিয়া', 'হাত জোড় করিয়া,' 'অমলের গায়ে হাত দিয়া'। এই সমস্ত জায়গায় সংলাপ এমনভাবে লেখা যে এ নির্দেশগুলো না থাকলেও হয়তো এগুলো আমরা অনুভব করতে পারতাম। আবার কিছু অতি প্রয়োজনীয় নির্দেশ আছে যা না থাকলে নাটকটা বুঝতেই আমাদের অসুবিধে হ'তো। যেমন মোড়ল যে-কাগজটা রাজার চিঠির নাম ক'রে অমলকে দিচ্ছে তার নিষ্ঠুরতাটা অত প্রকট হ'তো না, যদি ব'লে দেওয়া না থাকত—'একখানা অক্ষরশূন্য কাগজ দিয়া—'। পড়লে আমাদেরও ক্ষোভে রাগে চোখে জল আসে, যেন আমাদের আত্মার অপমান হ'লো, তাই ঠাকুরদার খেপে যাওয়াটা অত জ্যান্ত লাগে আমাদের কাছে। এই অন্যায়, এই নিষ্ঠুরতা দেখে ঠাকুরদার ঠোঁট কাঁপে, চোখ বিস্ফারিত হয়। বলেন,—'হাঁ আমি খেপেছি। তাই আজ এই সাদা কাগজে অক্ষর দেখতে পাচ্ছি। রাজা লিখছেন, তিনি স্বয়ং অমলকে দেখতে আসছেন, তিনি তাঁর রাজকবিরাজকেও সঙ্গে আনছেন।'

অমল যে কী খুশী হয়! সে, আমরা যেন দেখতে পাই, উত্তেজনায় উঠে বসবার চেষ্টা করতে করতে বলছে,

'ফকির, ওই যে ফকির, তাঁর বাজনা বাজছে শুনতে পাচ্ছ না?'...

তারপরই যেন নিস্তেজ হ'যে আসে আর হাত বাড়িয়ে মোড়লের পায়ের ধুলো নেবার চেষ্টা করে শুয়ে শুয়ে।

রবীন্দ্রনাথ তৃতীয় দৃশ্যে যে অন্য অংশের তুলনায় বেশী নির্দেশ দিয়েছেন তারও একটা মজা আছে। নির্দেশ দিয়েছেন আবার অনেককিছুই বলেনওনি। যেমন কবিরাজ যখন ব'লে যায় দরজা জানালা ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে দিতে তখন মাধবদত্ত যে সত্যিই বন্ধ করল এমন নির্দেশ কোথাও লেখা নেই। কিন্তু নিশ্চয়ই করেছিল। কারণ পরবর্তী বেশ কিছু সংলাপে বোঝা যায় দরজা-জানালা বেশ ভালোভাবেই বন্ধ করা হ'য়েছে। অমল বলে,—

'সন্ধ্যাতারা কি উঠেছে ফকির ? আমি কেন দেখতে পাচ্ছি নে ?'
ঠাকুরদা বলেন,
'ওরা যে জানলা বন্ধ ক'রে দিয়েছে, আমি খুলে দিচ্ছি।'
তার একটু পরেই রাজকবিরাজ ঢুকেই বলছেন,
'এ কি ! চারিদিকে সমস্তই যে বন্ধ ! খুলে দাও, খুলে দাও, যত দ্বারজানালা আছে সব খুলে দাও।'
অর্থাৎ ঠাকুরদা 'খুলে দিচ্ছি' বলা সত্ত্বেও খুলে দেওয়ার সুযোগ পাননি। আর এইবার রাজকবিরাজ বলার পরে খুলে দেওয়া হয়। কে যে খুলে দিল সে সম্পর্কে কোনো উল্লেখ বা নির্দেশ নেই নাটকে। আমরা অনুমান ক'রি ঠাকুরদাই খুলে দেন, হয়তো রাজদূত সাহায্য করেন। খুলে যে দেওয়া হয় তা নিশ্চিত। লেখা আছে রাজকবিরাজ বলছেন,
'বাবা, কেমন বোধ করছ ?'
আর অমল বলে সে খুব ভালো বোধ করছে। আরামের নিঃশ্বাস ফেলে সে। বলে,
'আঃ সব খুলে দিয়েছ—সব তারাগুলিকে দেখতে পাচ্ছি—অন্ধকারের ওপারকার সব তারা।'
আরেকটা খুব জরুরী নির্দেশ আমাদের বুঝে নিতে হয়—খুব নাড়া খাওয়ার অংশ, অমলের অভিনয় সংক্রান্ত।
মাধবদত্ত অমলের কানে কানে রাজার কাছে প্রার্থনা করতে বলেন, অমলও উত্তর দেয় সহজেই। কতরকম কথা সে বলে। কিন্তু সে যে ক্রমশঃ মৃত্যুর কোলে ঢ'লে পড়ছে, তা বুঝতে পারি বেশ খানিক পরে রাজকবিরাজের কথায়,—'এইবার তোমরা সকলে স্থির হও। এল, এল, ওর ঘুম এল।' তখন বুঝতে পারি এর প্রস্তুতি অমলের অভিনয়ে একটু আগে থেকেই আসবে, এবং তার শেষ কথার সময়ে সেটা বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে।

তাই তৃতীয় দৃশ্যে কিছুটা সাহায্য থাকলেও আমাদের ভাবনার খেলা কিন্তু থেমে যায় না, খেলা যেন গম্ভীর হ'য়ে ওঠে। ভাবতে ভাবতে আরও গভীরে যেন ডুব দিতে হয় আমাদের।

এইবারে একেবারে শেষটুকু—

রাজকবিরাজ

এইবার তোমরা সকলে স্থির হও। এল, এল, ওর ঘুম এল। আমি বালকের শিয়রের কাছে বসব—ওর ঘুম আসছে। প্রদীপের আলো নিবিয়ে দাও—এখন আকাশের তারাটি থেকে আলো আসুক, ওর ঘুম এসেছে।
যখন কবিরাজ (রাজকবিরাজ নয়, গ্রামের কবিরাজ) অমলকে দেখতে এসেছিলেন তখনো সূর্যাস্ত হয়নি। হ'চ্ছে। তাই মনে হয় কবিরাজের নির্দেশমত যখন দরজাজানালা বেশ ভালো ক'রে বন্ধ করা হ'লো তখন নিশ্চয়ই প্রদীপটা জ্বালা হয়েছিল। সম্ভবতঃ ঠাকুরদা জ্বেলেছিলেন। এখন

রাজকবিরাজের নির্দেশে প্রদীপ নেবানো হয়। সে-ও নিশ্চয়ই ঠাকুরদা অথবা রাজদূত নেবান। ঘর এমন অন্ধকার করাতে মাধবদত্তর তো সায় নেই, আর নিষ্ঠুর মোড়ল তখন ভীত হ'য়ে কাঠের মত একপাশে দাঁড়িয়ে। তাহলে নিশ্চয়ই ওঁরাই কেউ নিবিয়েছেন বাতি — আশ্চর্য্য লাগে এমন একটা তাৎপর্যপূর্ণ কাজ—তার কোনো নির্দেশ দেওয়া নেই! খালি প্রদীপের উল্লেখটুকু আছে—অথচ কে কখন জ্বালালেন আর কে কখন নেবালেন সেসবটাই আমাদের নিজেদের বার ক'রে নিতে হয়।

আর পড়তে পড়তে এ কথাও কেমন মনে হয় রাজকবিরাজের গম্ভীর গলা এই সংলাপের অংশে আরো খাদে নেমে চলে, অনেক অনেক খাদে। 'ওর ঘুম এসেছে' এই সংলাপটি বলার সময়ে গভীরতর খাদে। সর্বশরীরে যেন কাঁটা দেয় আমাদের, বুকের ভেতরটা ফাঁকা লাগে, গলা শুকিয়ে আসে। মনে হয় মঞ্চে তখন কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধতা নেমে আসে। কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। মোড়ল ছাতাটি নিয়ে এক কোণে, রাজদূত দরজার কাছে—যে দরজা ভেঙে সে ঢুকেছিল, ঠাকুরদা অমলের মাথার কাছে হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে, কিংবা ঠিক তার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে মেঝেতে ব'সে। সবাই মূর্ত্তির মত নিশ্চল। মাধবদত্ত যেন এদের মাঝখানে দিশাহারা, সবার মুখের দিকে চায় একে একে। ঠিক বুঝে উঠতে পারে না কি হ'লো! অমল যে একটু আগে বলল তাকে, রাজা এলে সে কত কি চাইবে! তারপর কি হ'লো?

মাধবদত্ত

(ঠাকুরদার প্রতি) ঠাকুরদা তুমি অমন মূর্ত্তিটির মতো হাত জোড় ক'রে নীরব হ'য়ে আছ কেন? আমার কেমন ভয় হ'চ্ছে। এ যা দেখছি এসব কি ভালো লক্ষণ? এরা আমার ঘর অন্ধকার ক'রে দিচ্ছে কেন? তারার আলোতে আমার কী হবে!

ঠাকুরদা

চুপ করো অবিশ্বাসী, কথা কোয়ো না।

মাধবদত্ত প্রথমে যেন আস্তে শুরু করেন বলতে এবং ক্রমশঃ তাঁর সংলাপ যেন হাহাকারে পরিণত হয়। ঘরের নিস্তব্ধতা থান্ থান্ হ'য়ে যায়। তাই যেন ঠাকুরদা হাত জোড় করা অবস্থাতেই, তেমনি চোখ বন্ধ ক'রেই বলেন, 'চুপ করো অবিশ্বাসী কথা কোয়ো না।' গলা দিয়ে স্পষ্ট আওয়াজ বোধহয় বেরোয় না তাঁর। চোখ দিয়ে জল পড়ে। এর পর—

সুধার প্রবেশ

সুধা

অমল!

রাজকবিরাজ

ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুধা

আমি যে ওর জন্যে ফুল এনেছি—ওর হাতে কি দিতে পারব না ?

রাজকবিরাজ

আচ্ছা, দাও তোমার ফুল।

সুধা

ও কখন জাগবে ?

রাজকবিরাজ

এখনই, যখন রাজা এসে ওকে ডাকবেন।

সুধা

তখন তোমরা ওকে একটি কথা কানে কানে ব'লে দেবে ?

রাজকবিরাজ

কী বলব ?

সুধা

বোলো যে 'সুধা তোমাকে ভোলেনি।'

নাটক এইখানেই শেষ হয়। —আমাদের মনে হয় সুধা কি একেবারেই ঢুকে পড়েছিল ঘরে ? তার মল ঝম্‌ঝম্‌ ক'রে বাজতে বাজতে অমলের শয্যার পাশে থেমেছিল ? সে ডেকেছিল, 'অমল !'

নাকি সমবয়সী সাথীকে খুঁজতে এসে শিশুরা যেমন ডাকতে থাকে চেঁচিয়ে তেমনি বাইরে থেকেই ডেকেছিল, 'অম-ল !' সাড়া না পেয়ে ভেতরে চ'লে এসেছিল, আর এত লোকজন দেখে থমকে গিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে বলেছিল—অমল !

রাজকবিরাজ তার জিজ্ঞাসার উত্তর দেন। ধীরে ধীরে বলেন—'ও ঘুমিয়ে পড়েছে।'

কিন্তু অমল যে ফুল চেয়েছিল ! সুধা যে কথা দিয়েছিল 'আসব' ! বলেছিল আসবেই সে। বলেছিল সব মনে থাকবে তার ! বলে,

—আমি যে ওর জন্যে ফুল এনেছি ওর হাতে কি দিতে পারব না ?

কবিরাজ বলেন,

—আচ্ছা, দাও তোমার ফুল।

কিন্তু কোথায় দেয় সুধা ফুল ?

আমরা ঝাপসা চোখে কল্পনা ক'রি—অমলের হাতের কাছে মাথার কাছে সুধা ফুলগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে, তারপর কোমল নিষ্পাপ চোখ তুলে কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করছে,

—ও কখন জাগবে ?

অমল তো আর জাগবে না। 'রাজা'-র আশ্রয়ে অমলের সে হবে এক অন্য যাত্রা, সেই যাত্রার পথে অমল এই মন্ত্র নিয়ে যাবে কানে যে জীবনের সুধা তাকে ভোলেনি।

কে সুধা ?

অমৃত ?

অমল তো অনেক কিছু হ'তে চেয়েছিল। পারেনি। কিন্তু তার সাধন একেবারে ব্যর্থ নয়। তার পূজো হারিয়ে যায় না। অমলকে সুধা ভোলে না। রাজকবিরাজকে বলে সে,

—তুমি একটু কানে কানে ব'লে দিও যে সুধা তাকে ভোলেনি।

এই কথা কটি ব'লে সুধা যখন শেষবারের মত অমলকে ভালো ক'রে দেখবার চেষ্টা করে তখন মঞ্চে উপস্থিত অন্য চরিত্রদের বুকে যেমন কান্না গুমরে ওঠে, পাঠক বা দর্শক হিসাবে আমাদের গলায়ও তখন কান্না দলা পাকিয়ে ওঠে।

খেলাটি আমদের এইখানেই টেনে নিয়ে আসে। খেলা খেলতে খেলতে এ কোন্ গভীরে পৌঁছই আমরা ! কোন্ অতল অনুভব ! তবে,—অতল এই গভীরতাব অনুভবে পৌঁছনোর জন্যই তো আমাদের এই খেলা !

[এইরকম ভাবনা নিয়ে খেলা মনেব মধ্যে চলছিল। একদিন আমার আত্মীয় সুবীর আর জয়িতাদেব সঙ্গে কথায় কথায় এই খেলাব কথা বেবিয়ে পড়ল। সুবীর মিত্র মাবফৎ এই সংবাদ পেযে শ্রীসাগবময় ঘোষ আগ্রহী হন এবং ১৯৮১-ব 'দেশ' বিনোদন সংখ্যায় লেখাটি প্রকাশিত হয়।

'ডাকঘর' আমাব মা শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রের নির্দেশনায় বহুরূপীব প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয় দু'বাব—বেশ অনেকবছরেব ব্যবধানে। প্রথমবার '৫৬ সালে—যখন আমি অমলের ভূমিকায় অভিনয় করি। দ্বিতীযবাবে ১৯৭৩ সালে যখন আমি মাকে প্রযোজনায সাহায্য করি। এত বেশী 'ডাকঘরে'-র সঙ্গে মিশে থাকবার পরে সেই প্রযোজনাব স্মৃতি অনুসরণ ক'রেই লেখাটি শুরু হ'য়েছিল। কিন্তু পডতে পড়তে অন্য অনেক অনুভবও আমাব মনেব দরজায় ঘা মাবতে লাগল। তাই অনেক বর্ণনা এব মধ্যে আছে—অভিনযেব—যা ঐ প্রযোজনার মত নয়। এইসব মিলেমিশেই এই লেখাটি তৈবী হ'য়েছে।]

অনুভব : 'ঘরে বাইরে'

বহুরূপী 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেছিল ১৯৭৪-এ। নাট্যরূপ ও নির্দেশনার দায়িত্বে ছিলেন মা। আমার পড়েছিল 'বিমলা'-র ভূমিকায় অভিনয় করবার দায়িত্ব।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসকে আমার অসাধারণ এক উপন্যাস ব'লে বোধ হয়। বরাবরই। বেশ অল্পবয়স থেকেই এর ভাষার গঠন, শক্ত কথা সহজ ক'রে বলবার কৌশল আমাকে আকর্ষণ করত। তখন কি আর অত কিছু বুঝতাম ? তবু আকর্ষণ করত।

আমি কিছু বচ্ছর আগে দু'জন খ্যাতিমান এবং প্রকৃত অর্থে বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্বকে আলোচনা করতে শুনেছিলুম 'ঘরে বাইরে' নিয়ে। দুজনেই বলছিলেন—পৃথিবীর সাহিত্যে যতগুলো প্রথমসারির উপন্যাস আছে 'ঘরে বাইরে' তার মধ্যে একটি। বলছিলেন,– 'ঘরে বাইরে', যতরকমভাবে মানুষের সমাজকে বা ব্যক্তিগত মানুষকে প্রকাশ করেছে, সমস্যার নানান স্তরকে উদ্‌ঘাটিত করেছে, পৃথিবীর তাবৎ সাহিত্যের মধ্যে খুব কম উপন্যাসে এমনটা আছে।—অথচ আমরা দেখেছি এই সমাজেরই, আমাদের এই আধুনিক বঙ্গসমাজের কিছু মানুষ, প্রতিষ্ঠিত মানুষ এই উপন্যাসকে অর্থহীন আখ্যা দিয়েছেন। বড় আশ্চর্য লাগে। আশ্চর্য লাগে আমাদের মত মানুষদের—যাদের অত বুদ্ধি নেই, যাদের ধাঁধা লেগে যায় বিভিন্ন মতামতের চক্করে প'ড়ে। তাই মনে হয় চেষ্টা করা যাক তো নিজের বোধ দিয়ে অনুভব করবার ! করতে তো হবেই অনুভব, অভিনয় যদি করতে হয় ! আমাদের তো ঐখানেই মরণ ! মাথা খুঁড়ে অনুভব করবার চেষ্টা করতে হয় যে ! তবে তো প্রকাশের কথা !

বিমলাকে দিয়েই শুরু করা যাক। এই চরিত্রকে নিয়েই তো আমার শিকড় খোঁজার প্রয়াস !

বিমলা শামলা, কিন্তু বর্ণনায় বোঝা যায় সুন্দরী। তবে 'সুন্দর'-এর সংজ্ঞা

সব যুগে একরকম থাকে না। যে সময়ের কথা এ উপন্যাসে আছে তখন বোধ ক'রি তাকেই বলা হ'তো সুন্দর যে টকটকে ফর্সা, যার শরীরটা ছোটখাট, একটু ভারী হ'লে বোধ হবে শরীরে জোয়ার এসেছে। মেয়েদের চেহারা যেন এমনটি হ'লেই ভালো। রোগা-পাতলা চেহারা খুব আদৃত হয় না। সেইরকম একটা সময়ে বিমলা রাজবাড়ীতে এল কেবল সুলক্ষণের জোরে। আর স্বামীর নিবিড় ভালোবাসা কিন্তু পেল সে! তার শামলা অথচ উজ্জ্বল দীর্ঘাঙ্গী চেহারা, তার এক ঢাল চুল, তার বড় কালো চোখ—নিখিলেশ ভালোবেসে ফেলল তাকে নিবিড় ক'রে। আর তার জন্যে কত কিই করতে প্রস্তুত নিখিলেশ! তাকে শিক্ষিত করতে, তার মনটাকে উন্নত করতে, তাকে নানা আভরণে, নানা পরিধানে সাজাতে নিখিলেশের কি অসীম প্রয়াস।

বার বার পড়তে পড়তে হঠাৎ একদিন মনে হ'লো—রবীন্দ্রনাথ এখানে একটা আশ্চর্য্য বিষয় প্রকাশ করেছেন তো: যে-বিমলা খুব সাধারণ বাড়ী থেকে এসেছে, এত আদরে-যত্নে-মনোযোগে যে-বিমলার ভেসে যাবার কথা, কৃতজ্ঞ হবার কথা—সেই বিমলার কিন্তু কিছুদিন বাদেই মনে হ'লো এ তার পাওনা—কিরকম অভ্যাস হ'য়ে গেল পাওয়াটা। সৌন্দর্য্য নিয়ে তার হীনমন্যতা সত্ত্বেও,—নাকি সেইজন্যেই?—জানি না। অনেক পেলে হয়তো মানুষের অহঙ্কার হয়—সেইজন্যে অমন হ'লো! তাও তো হ'তে পারে! হয়!

সে তখন ইংরিজি শিখেছে, দেশবিদেশের বই পড়ছে। তার নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে সে নিখিলেশের কাজের বিচার করতে শুরু করল, মতামতে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করল। নিখিলেশ যখন মনে ক'রেছিল বড়রানী-মেজরানীর হাতে কর্তৃত্ব ছেড়ে সে কলকাতায় গিয়ে থাকবে, বিমলা তা হ'তে দিলে না। এইখানে তাদের পূর্ণসম্মান। কলকাতায় তাদের কে চেনে! নিখিলেশ বলেছিল।

"দরকার কি তোমার ঐ আসনের? এ ছাড়াও তো জীবনের আরো অনেক জিনিষ আছে, তার দাম অনেক বেশি।"

বিমলা একথা মানলে না কিছুতে।

বিমলার বয়স তখন কত হবে? তখনকার সময় অনুযায়ী যদি খুব বেশী বয়সেও তার বিয়ে হ'য়ে থাকে তবু তেরো-চোদ্দর বেশী ছিল না তার বিয়ের বয়স। আর এ কাহিনীর শুরু তার বিয়ের ন'বছর বাদে। তার মানে একুশ-বাইশ কি বাইশ-তেইশ বছর বয়স তখন তার! সেই বিমলা! যে জীবনের ধাক্কা তখনও খায়নি, যে-বিমলার সৌভাগ্য উপচে পড়েছে পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মতন। বিমলা, যাকে নিখিলেশ আদর ক'রে বলত বিমল—অর্থাৎ নির্মল—সেই সরল বিমল মেয়ে, আবেগে ভরপুর।

তার সীমারেখা ছিল রাজবাড়ীর অন্দরমহলটুকু। হঠাৎ বাইরের মুখোমুখি হবার প্রস্তুতি তার ছিল না। বাইরে এসে তার বিশালতা, তার ব্যাপকতা বিমলার বিচারবুদ্ধিকে কেমন গোলমাল ক'রে দিল, সে অন্য একরকম বুঝল। এক ধাক্কায় সে এমন এক ঘোরের মধ্যে পড়ল যখন সমস্ত সরলীকরণ করা কথাগুলো তার ঠিক মনে হ'তে লাগল। কথাগুলো ভালো মনে ক'রেছিল ব'লেই সে ঐ সরলীকৃত শ্লোগানে বিশ্বাস ক'রেছিল। সরলীকৃত শ্লোগানে

ভালোমানুষও বিপথে চ'লে যাচ্ছে এ ঘটনা তো আজও দেখি আমরা। দেখি না?

নিখিলেশ বোধ ক'রি ভেবেছিল বিমলা অন্দরমহলের গণ্ডী ছাড়িয়ে পৃথিবীকে চিনে নিখিলেশকে বরণ ক'রে নিক। ভেবেছিল, বিমলা ঘরের বাইরে এলে, বাইরেটাকে দেখলে, অনুভব ক'রলে, বুঝতে পারলে তার দৃষ্টিকোণটা বুঝতে পারবে। নানান ব্যাপারে তার মতামত, সিদ্ধান্ত ইত্যাদিকে উপলব্ধি করতে পারবে। তাই হয়তো সে কলকাতা যাবার সিদ্ধান্তও নিয়েছিল। কিন্তু বিমলার কাছে তখন তার 'শ্বশুরঘর' তার 'আপন স্থান' এসব খুব বড় হ'য়ে উঠেছিল। সে কিছুতেই গেল না। এই উপন্যাসটা প'ড়লে বেশ বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ নারীর 'আপনস্থানে'র বিচার অন্যভাবে করেন। সে একটি ব্যক্তি। শ্বশুরঘর, স্বামীর ছায়া এসবই নারীর আপনস্থান নয়। বিমলার আত্মকথাতেই আছে,
"তিনি আমাকে বরাবর ব'লে এসেছেন, স্ত্রী ব'লেই যে তুমি আমাকে কেবলই মেনে চ'লবে তোমার উপর আমার এ দৌরাত্ম্য আমার নিজেরই সইবে না। আমি অপেক্ষা ক'রে থাকব, আমার সঙ্গে যদি তোমার মেলে তো ভালো, যদি না মেলে তো উপায় কী!"
এইখানে কিরকম রবীন্দ্রনাথকে চিনতে পারা যায়।

নিখিলেশ বিমলাকে বাইরে নিয়ে এল। বিধাতা বুঝি অলক্ষ্যে হাসলেন। এইখানে একটা কথা উপলব্ধি ক'রে আমার রবীন্দ্রনাথকে অসাধারণ দ্রষ্টা ব'লে মনে হ'লো,—ঐ বার বার পড়তে পড়তে। মনে হ'লো—প্রত্যেকটা মানুষ তার ব্যক্তিগত অনুভব, তার নিজস্ব মানসিক গঠন, তার জেনেটিক কোয়ালিটি ইত্যাদি অনেকরকম উপাদান অনুযায়ী পৃথিবীর সঙ্গে তার সমঝোতা স্থাপনা করে। তাই নিখিলেশের ভাবনা অনুযায়ী যখন ব্যাপারটা ঘটল না—তখন যে বহুস্তরীয় জটিলতার সৃষ্টি হ'লো তখনই এই উপন্যাস অন্য এক স্তরে চ'লে গেল।
বিমলা বাইরে এল। —তারপর কোথায় গেল তার প্রতিদিন স্বামীকে পুজো করা! কোথায় গেল 'সতীত্বের তেজ'! বিমলার জীবন ওলটপালট হ'য়ে গেল। প্রথম দিন থেকেই। সে সন্দীপের সামনে যাবে ব'লে মাথা ঘ'সে সুদীর্ঘ এলোচুল লাল রেশমের ফিতে দিয়ে জড়িয়ে নিলে, জরিপাড়ের সাদা মাদ্রাজী শাড়ী পরলে আর জরির পাড় দেওয়া হাতকাটা জ্যাকেট। মনে মনে নিজেকে বোঝালে, 'আমি যদি বেশ ভদ্ররকম সাজ না ক'রেই সন্দীপবাবুর সামনে বেরোই তা হলে আমার স্বামী রাগ করবেন—মেয়েরা যে সমাজের শ্রী।' এইরকম নানা যুক্তি দিয়ে আজও মানুষ পথভ্রষ্ট হবার সময়ে নিজেকে ভোলায়! অহরহ। তাই মনে হয় রবীন্দ্রনাথ দ্রষ্টা। —সেই প্রথমদর্শনের দিনই সন্দীপ আবৃত্তি ক'রে উঠলে—

> এসো পাপ, এসো সুন্দরী!
> তব চুম্বন-অগ্নি-মদিরা রক্তে

ফিরুক সঞ্চরি।
অকল্যাণের বাজুক শঙ্খ
ললাটে লেপিয়া দাও কলঙ্ক
নির্লাজ কালো কলুষ পঙ্ক
বুকে দাও প্রলয়ঙ্করী।

বললে,
"যে আগুন বাহিরকে জ্বালায় আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি সেই আগুনের সুন্দরী দেবতা, তুমি আজ আমাদের সকলকে নষ্ট হবার দুর্জয় তেজ দাও, আমাদের অন্যায়কে সুন্দর করো।"
সন্দীপকে বিমলা মনে মনে পূজো করতে শুরু করলে।

কিন্তু তারপর যখন সে বুঝতে আরম্ভ করলে তখন সে 'জালে পড়া হরিণী'-র মত ছটফট করেছে, 'তার বড় বড় দুই চোখে কত ভয়, কত করুণা!' কিন্তু তখন এমন এক জায়গায় এসে সে দাঁড়িয়েছে যেখান থেকে ফিরে আসবার কোনো সোজা পথ নেই তার!

রবীন্দ্রনাথ চন্দ্রনাথ মাস্টারমশায়ের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন সন্দীপ অধার্মিক নয়, বিধার্মিক। তার মত ক'রে সে তার কার্যোদ্ধারের চেষ্টা করে, তাতে তার পাপ বোধ হয় না। ওর ধর্ম একটা আছে। যেটা ওর নিজস্ব। ও expediency (এক্স্‌পিডিয়েন্সি)-কে 'ধর্ম' ব'লে মনে করছে। ওর মনে হ'চ্ছে ফললাভের এইটাই উপায়।
"তোমার লোভ আছে তাই তুমি দেওয়াল গাঁথ; আমার লোভ আছে তাই আমি সিঁধ কাটি। তুমি যদি কল কর আমি কৌশল করব। এইগুলোই হ'চ্ছে প্রকৃতির বাস্তব কথা। এই কথাগুলোর উপরেই পৃথিবীর রাজ্য-সাম্রাজ্য, পৃথিবীর বড়ো বড়ো কাণ্ডকারখানা চলছে।"
এইসব তত্ত্ব নিয়ে সে চলে। তাই বিমলাকে ব্যবহার করতে সে দ্বিধা করেনি। মেয়েরা যে স্তাবকতায় একটু বেশী ভোলে এ সত্য সন্দীপের জানা ছিল।
"আমি যে চালে চলি তাতে মেয়েদের হৃদয় জয় করতে আমার দেরি হয় না। ...ওরা আমার চোখে-মুখে দেহে-মনে কথায়-ভাবে একটা প্রবল ইচ্ছা দেখতে পায়... বার বার দেখলুম আমার সেই ইচ্ছার কাছে মেয়েরা আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েছে, তারা মরবে কি বাঁচবে তার আর হুঁশ থাকেনি।"
কিন্তু পৃথিবী বড় জটিল তো! যা ভেবে যা করব তাই-ই ঘটবে এমনটা হয় না একথা মহৎসাহিত্যে সর্বসময়ে প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথও বার বার বলেছেন এ-কথা এই উপন্যাসে। তাই বোধ ক'রি শেষ অংশ প'ড়তে প'ড়তে মনে হয় সন্দীপও কি দুর্বল হ'য়ে প'ড়েছিল বিমলার প্রতি? নিছক কার্যোদ্ধার করা আর ঘটে ওঠেনি! তাই কি বিপদ আরো গভীর হ'লো? আর তাই কি শেষকালে সন্দীপকে ঐভাবে চ'লে যেতে হ'লো? পালাতে হ'লো? আর তার শিকার হ'লো অমূল্য?—নিষ্পা-প, নিষ্পাপ একটি কিশোর! সঙ্গে বুঝি নিখিলেশও।

বিমলা একজন বিশেষ নারী তো বটেই, আবার একরকম ক'রে সে নির্বিশেষও বটে। রবীন্দ্রনাথ অনেক জায়গায় এই 'বিশেষ' এবং 'নির্বিশেষ'কে মেলাতে পারেন।

নিখিলেশের চরিত্রে আমাদের ঐতিহ্যের প্রতিফলন আছে এ কথা যদি ধ'রে নিই—তবে সন্দীপ তার বিপরীত মেরুতে। তবে কি আরো বড় অর্থে বিমলা হ'লো আমার দেশ? আমার দেশের মানুষ? যদিও রবীন্দ্রনাথ প্রতীক বা রূপকের কথা মানতে চাননি তবু কেন জানি না এই কথা মনে হয়। মনে হয় তার সামনে দেশের উন্নতির দুটো পথ খোলা আছে।

(১) "বহু পরিশ্রমে সেই সত্যকে অনুসরণ করা যে সত্য নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত।"—এ মত নিখিলেশের। সে বলে— "দেশকে সাদা ভাবে সত্যভাবে দেশ ব'লেই জেনে, মানুষকে মানুষ ব'লেই শ্রদ্ধা ক'রে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না, চিৎকার ক'রে মা ব'লে দেবী ব'লে মন্ত্র প'ড়ে যাদের কেবলই সম্মোহনের দরকার হয়, তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয় যেমন নেশার প্রতি।" বলে, "যে কাজকে সত্য ব'লে শ্রদ্ধা ক'রি তাকে সাধন করবার জন্যে মোহকে দলে টানা চলবে না।"

আর

(২) "সত্য হ'চ্ছে আগাছা, কাঁটাগাছ। যে সত্যকে গ'ড়ে তুলতে হবে, সেই সত্যের জন্য অনেক মিথ্যে চাই। পৃথিবীতে যারা সৃষ্টি ক'রতে এসেছে তারা সত্যকে মানে না, বানায়।"

এ মত সন্দীপের। বলে,

"যারা রাজ্য বিস্তার ক'রেছে, সাম্রাজ্য গ'ড়েছে, সমাজ বেঁধেছে, ধর্মসম্প্রদায় স্থাপন ক'রেছে, তারাই তোমাদের বাঁধা সত্যের আদালতে বুক ফুলিয়ে মিথ্যে সাক্ষি দিয়ে এসেছে। যারা শাসন ক'রবে তারা মিথ্যেকে ডরায় না, যারা শাসন মানবে তাদের জন্যেই সত্যের লোহার শিকল।"

বলে,

"সত্য মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হ'চ্ছে ফললাভ।"

বলে,

"সেই ফসল মিথ্যের আবাদে ফলে।"

এই দুটো পথের সামনে এসে যদি মনস্থির করতে দেরী করে দেশের মানুষ তাহলে তার সমাজের নীতির কাঠামোর ওপরে আঘাত পড়ে। তারপরে সে তাকে বাঁচাতে পারবে তো?

আমার কেমন মনে হয় এ কথা আজও সত্যি। বড্ড সত্যি। আজকে যখন চতুর্দিকে নীতিবিগর্হিত কাজে আমরা সব আবদ্ধ হ'য়ে প'ড়েছি তখন তো এই কথা আরো বেশী ক'রে মনে হয়। এখন তো চারদিকে তাকিয়ে মনে হয় আমরা ডুবতেই চলেছি, আর বুঝি উপায় নেই।

কিন্তু তখন রবীন্দ্রনাথ সে পটভূমিতে একটা প্রশ্নচিহ্ন রেখে দিয়েছিলেন এ

প্রসঙ্গে। তাই বাঁচাতে পারবে না এই রকম কোনো নিশ্চিত বাক্য উচ্চারণ করতে চান না তিনি । —আর তাইজন্যেই কি নিখিলেশের মৃত্যুই হ'লো এইরকম কোনো নিশ্চিত সত্য প্রকাশ করেন না তিনি ?

'ঘরে বাইরে' ত্রিকোণ প্রেমের উপন্যাস নয়। এ উপন্যাস অনেক জটিলতার কথা বলে, অনেক ভাবনার কথা বলে পুরো সমাজটাকে পটভূমিতে রেখে। তা না হ'লে 'পঞ্চু' এত বিশিষ্ট হ'য়ে চ'লে আসত না সামনে। রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টির মতই এ উপন্যাসের ক্যানভাস অনেক বড়, অনেক বিস্তৃত। যেমন 'রাজা' নাটকে সুদর্শনার তীর্থযাত্রার সঙ্গে সাধারণ লোকের খেতে না পাওয়ার প্রসঙ্গ আনা হ'য়েছে—"যাদের ঘরে দু-মুঠো অন্ন জোটে না তাদের আবার রাজা কিসের ?"—যদি কেবলই 'মিস্টিক কবি'র রচনা হ'তো এটি, তাহ'লে বাস্তবকে এমন তীব্র ক'রে প্রকাশিত হ'তে দেখতে পেতাম কি আমরা ? তেমনি 'ঘরে বাইরে'-তে পঞ্চু, মাস্টারমশায়, পঞ্চুর মামী, কাসেম, মিরজান সব এত জীবন্ত হ'য়ে ওঠে যে বলবার নয়।
যেমন,—একটু দেখা যাক পঞ্চু আর পঞ্চুর মামীর কাহিনীতে উঁকি মেরে। পঞ্চুকে বাঁচাবার জন্য নিখিলেশ তার জমি কিনে সেই জমিতেই ওকে নিজের প্রজা ক'রে রেখে দিলে। মাস্টারমশায় পঞ্চুর বাচ্ছাদের নিজের বাড়ীতে নিয়ে এসে রাখলেন।

"পঞ্চুর বিষয়সম্পত্তি ওর মাতামহের। পঞ্চু ছাড়া তার ওয়ারিশ কেউ ছিল না, এই কথাই সকলের জানা। হঠাৎ কোথা থেকে এক মামী এসে জুটে জীবনস্বত্বের দাবি ক'রে তার পুঁটুলি, তার প্যাটরা, হরিনামের ঝুলি এবং একটি প্রাপ্তবয়স্ক বিধবা ভাইঝি নিয়ে পঞ্চুর ঘরের মধ্যে উপস্থিত।"
পঞ্চুর মামী বহুকাল মাবা গেছে। মামী বললে, সে দ্বিতীয় পক্ষ। পঞ্চু বললে মামা যে মামীরও অনেক আগে মরেছে! মামী বললে প্রথমপক্ষ থাকতে বহুবছর আগেই সে দ্বিতীয়পক্ষ হ'য়েছে, সতীনের ভয়ে শ্বশুরঘর করেনি।
নিখিলেশের আত্মকথায় দেখি— "হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল মাস্টারমশায় কদিন ছিলেন না, কোথায় ছিলেন তা জানিও নে। ...জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি কোথায় ছিলেন ? মাস্টারমশায় বললেন, পঞ্চুর বাড়ীতে।
—পঞ্চুর বাড়ীতে ? এই চারদিন সেখানেই ছিলেন ?
—হাঁ মনে ভাবলুম যে মেয়েটি পঞ্চুর মামী সেজে এসেছে তার সঙ্গেই কথাবার্ত্তা ক'য়ে দেখব। আমাকে দেখে প্রথমটা সে একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল; ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়েও যে এত বড়ো অদ্ভুত কেউ হ'তে পারে একথা সে মনে করতেও পারেনি। দেখলে যে আমি র'য়েই গেলুম। তারপরে তার লজ্জা হ'তে লাগল। আমি তাকে বললুম, মা, আমাকে তো তুমি অপমান ক'রে তাড়াতে পারবে না। আর আমি যদি থাকি তা হ'লে পঞ্চুকেও রাখব; ওর মা-হারা সব ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে, তারা পথে বেরোবে এ তো আমি দেখতে পারব না। দুদিন আমার কথা চুপ ক'রে শুনলে; 'হাঁ'-ও বলে না,

'না'-ও বলে না ; শেষকালে আজ দেখি পোঁটলাপুঁটলি বাঁধছে। বললে, আমরা বৃন্দাবনে যাব, আমাদের পথ খরচ দাও। বৃন্দাবনে যাবে না জানি, কিন্তু একটু মোটারকম পথখরচ দিতে হবে! তাই তোমার কাছে এলুম।
—আচ্ছা সে যা দরকার তা দেব।
—বুড়িটা লোক খারাপ নয়। পঞ্চু ওকে জলের কলসী ছুঁতে দেয় না, ঘরে এলে হাঁ হাঁ ক'রে ওঠে—তাই নিয়ে ওর সঙ্গে খুঁটিনাটি চলছিল। কিন্তু ওর হাতে আমার খেতে আপত্তি নেই শুনে আমাকে যত্নের একশেষ করেছে। চমৎকার রাঁধে। আমার উপরে পঞ্চুর ভক্তিশ্রদ্ধা যে একটুখানি ছিল তাও এবার চুকে গেল। আগে ওর ধারণা ছিল অন্তত, আমি লোকটা সরল ; কিন্তু এবার ওর ধারণা হয়েছে আমি যে বুড়িটার হাতে খেলুম সেটা কেবল তাকে বশ করার ফন্দি। সংসারে ফন্দিটা চাই বটে, কিন্তু তাই ব'লে একেবারে ধর্মটা খোয়ানো ? ...যা হোক বুড়ি বিদায় হ'লেও কিছুদিন আমাকে পঞ্চুর ঘর আগলে রাখতে হবে, নইলে হরিশকুণ্ডু কিছু-একটা সাংঘাতিক কাণ্ড ক'রে বসবে। সে নাকি পারিষদদের ব'লেছে, আমি ওর একটা জাল মামী জুটিয়ে দিলুম, ও বেটা আমার উপর টেক্কা মেরে কোথা থেকে এক জাল বাবা জোগাড় করেছে। দেখি, ওর বাবা ওকে বাঁচায় কী ক'রে।
আমি বললুম,
ও বাঁচতেও পারে, মরতেও পারে, কিন্তু এই-যে এরা দেশের লোকের জন্যে হাজার রকম ছাঁচের ফাঁস-কল তৈরী করছে, ধর্মে, সমাজে, ব্যবসায়ে, সেটার সঙ্গে লড়াই করতে করতে যদি হারও হয় তা হ'লেও আমরা সুখে মরতে পারব।"
কেবলই ত্রিকোণ প্রেমের উপন্যাস হ'লে এত কথা বলবার প্রয়োজন হ'তো না রবীন্দ্রনাথের। নিখিলেশের শেষের কথাক'টি আজকে আমাদের মত মানুষের প্রাণের কথা ব'লে বোধহয়।

দেশের বিদেশের কিছু কাহিনীর সঙ্গে অনেক সময়ে 'ঘরে বাইরে'-র তুলনা করা হয় এদের নায়িকারা স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষে আসক্ত হ'য়েছিল ব'লে। কিন্তু 'ঘরে বাইরে' আমার অনুভবে কোথাও এ-সবকে ছাপিয়ে অন্য মাত্রায় চ'লে যায়, চ'লে যায় সেখানে, যেখানে তিনচারটে দৃষ্টিভঙ্গীকে সমপরিমাণ সুযোগ দিয়ে তাদের সংঘর্ষের মধ্যে থেকে সত্যের জটিল রূপ প্রকাশ করা যায়।

নিখিলেশকে অনেকে বলেন ইমেজস্বরূপ, ঠিক রক্তমাংসের মানুষ নয়। এমন কি 'নপুংসক' আখ্যা দিতেও শুনেছি। কেন, কোনদিক থেকে এমন মনে হয় আমার বোধ দিয়ে বুঝে উঠতে পারি না আমি। আমি বুঝতে পারি না নিখিলেশের মধ্যে পৌরুষের অভাব কোথায়! সে জোর খাটায় না ব'লে ? সমস্ত পৌরুষ কি তবে ঐ জোর খাটানোতে প্রকাশ পাবে মানুষের ? প্রথম অংশে বিমলা বলে, কলকাতায় যাবার প্রসঙ্গে,

"আমার স্বামী আমাকে জোর ক'রে কেন নিয়ে গেলেন না ? আমি জানি কেন। তাঁর জোর আছে ব'লেই তিনি জোর করেননি।"
নিখিলেশ নিজে বলে,
"জবরদস্তিকে আমি বরাবর দুর্বলতা ব'লেই জানি। যে দুর্বল সে সুবিচার করতে সাহস করে না ; ..."
সে যখন বলে,
"দেখো সন্দীপ, মানুষ মরণান্তিক দুঃখ পাবে কিন্তু তবু মরবে না এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় আছে, তাই আমি সব সইতে প্রস্তুত হয়েছি জেনেশুনে বুঝেসুঝে।"
তখন নিখিলেশকে কেমন মনে হয় ? ঐ, ইমেজস্বরূপ ? রক্তমাংসের সত্যকার মানুষই তো এমন ক'রে দায় বহন করতে পারে ! আমার তো ভীষণ জীবন্ত ব'লে বোধ হয়। তার দার্ঢ্য, তার মায়া, তার বিচারবোধ, তার ব্যথাবোধ, তার অসহায়তা—সব, সবটা যেন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। জানি না, আমার তো এইরকমই মনে হয়।

আর একটা কথাও খুব মনে হয় আমার। 'ঘরে বাইরে'-তে পাত্রপাত্রীর মুখে যেসব সংলাপ আছে—তা পঞ্চুর হোক বা নিখিলেশের, সন্দীপের হোক বা অমূল্যের হোক, বা মাস্টারমশায়ের হোক কিংবা বিমলার হোক বা মেজরানীর বা থাকোর কি ক্ষ্যামার—এ সবই যেন আমাদের এখনকার কথোপকথনের যে স্ট্রাকচার তার সঙ্গে বেশ মিলে যায়। বলতে কোনো অসুবিধা হয় না, বেশ স্বাভাবিক লাগে। অথচ ভাষার মর্যাদা বলতে যা বুঝি তাও পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত থাকে। অভিনয়কালে আমাদের রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে বদল করতে হয়নি তো, বরং সেই ভাষা আমাদের ভালো অভিনয়ের সুযোগ ক'রে দিয়েছিল। যদি অভিনয় কিছুটা ভালো হ'য়ে থাকে তা ঐ রবীন্দ্রনাথের কাহিনী আর ভাষার গুণে।

রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর বাঁধুনিতে কোনো একটি মানুষের কাজ কখনোই তার ব্যক্তিগত স্তরে থাকে না। মানুষ সামাজিক জীব। তাই কারো ন্যায়বোধের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি ঘটলে সে একাই ডোবে না, তার সঙ্গে আরো পাঁচটা মানুষের সর্বনাশ ঘটায়। এখানেও সেই বিশেষ ঘটনা নির্বিশেষের স্তরে পৌঁছয়। এই অনুভবটা বার বারই হয় এ উপন্যাস প'ড়ে। বিমলা বলেও এক জায়গায়,
"অমূল্য চ'লে যেতেই আমার বুক দ'মে গেল। কোন্ মায়ের বাছাকে বিপদে ভাসালুম ! ভগবান, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমন সর্বনেশে ঘটা ক'রে কেন। এত লোককে নিমন্ত্রণ ! আমার একলায় কুলোল না ? এত মানুষকে দিয়ে তার ভার বহন করাবে ! আহা, ঐ ছেলেমানুষকে কেন মারবে ?"
এর সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ে যায়— 'রাজা' নাটকে সুরঙ্গমার সংলাপ—
"সংসারে তো আমরা কেউ একলা নই মা, একজনের দায় যে অপরকে বহন করতে হয়, আর সেইজন্যেই তো এত ভয় !"

এই সংলাপটা আমাকে বলতে হ'তো মঞ্চে, তাই বোধ ক'রি খুব বেশী ক'রে মনে পড়ত।

ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের এই অহরহ সম্পর্ক বড় তীব্রভাবে প্রকাশ পায় 'ঘরে বাইরে'-তে। আর সে 'সমাজ' ক্ষুদ্র অর্থের সমাজ নয়—জীবন—ব্যাপক অর্থে। তাই 'ঘরে বাইরে'-র শেষে ঐ ভয়াবহ তছনছ করা সমাজ, আগুন লেগে যাওয়া—এ সব এত তীব্রভাবে প্রকাশ পায়। সেই পটভূমিতে চরিত্রগুলো দাঁড়ায়। বিশেষতঃ বিমলা। সে তখন অনুভব করছে, করতে পারছে নিখিলেশকে। নিখিলেশ তখন অচেতন, সে কি বাঁচবে? না অস্বীকৃত হবে?

বিমলা তখন আর নড়তে পারছে না। আরতির ঘন্টা বেজেছে কি? সন্ধ্যাপ্রদীপ কি জ্বলেছে? বিমলা জানে না কিছু। ঘন্টার পর ঘন্টা স্থির দাঁড়িয়ে সেই জানালাটির কাছে।

'ঘরে বাইরে' যখন আমরা করেছিলুম তখন এত কথা এত স্পষ্ট ক'রে ভেবেছিলুম? এই সবটা? জানি না। কিন্তু অনুভব করেছিলুম কোথাও বোধহয়, ক্রমশঃ করছিলুম। কিন্তু সম্পূর্ণতা পাচ্ছিল না তা আমাদের অভিনয়ে। তাই কেবলই বাধা পাচ্ছিল প্রকাশ। কত মূল্য দিয়ে বিমলার উপলব্ধির স্তর গভীর হ'লো? এসব পারছিলুম কি প্রকাশ করতে? মনে কি বুঝছে পারছিলুম যে আপন স্থান থেকে ছিটকে আসা এক নারী, যে কেবলই ছটফট করেছে, কষ্ট পেয়েছে—সে কিসের মুখোমুখি হ'য়ে দাঁড়ালো অনিশ্চয়তার দোলায় দুলতে দুলতে? জানি না, বোধহয় পারিনি সবটা।

এখনো 'ঘরে বাইরে' প'ড়ি। আর শেষকালে যেখানে ঐ দোতলায় দাঁড়িয়ে বিমলা শুনতে পায়— নিখিলেশ সম্পর্কে দেউড়িতে তখন আলোচনা—আহত, অচেতন নিখিলেশ—

"দেওয়ানজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ডাক্তারবাবু কী মনে করেন?'
ডাক্তার বললেন, 'কিছু বলা যায় না। মাথায় বিষম চোট লেগেছে।'
'আর অমূল্যবাবু?'
'তাঁর বুকে গুলি লেগেছিল, তাঁর হ'য়ে গেছে।"

এসব বিমলা শুনতে পায়। কিন্তু স্বর বেরোয় না, আর নড়তে পারে না সে। তাই তখন মনে হয় এখন সে কাকে গ্রহণ করবে? উপলব্ধি তার কোন্ গভীরতর স্তরে তাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিচ্ছে?

এইরকমই একটা ভাবনা ঘোরে মাথার মধ্যে, পড়তে গিয়ে, অনেক স্তরের 'সত্য'-কে অনুভব করবার পর। সেই সত্যের মুখে দাঁড়িয়ে। এখনো। বার বার।

['ঘরে বাইরে' সম্পর্কে একটা ছোট্ট লেখা লিখতে হ'য়েছিল শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ চেয়েছিলেন ব'লে, কিন্তু তিনি আর ছেপে উঠতে পারেননি। এই বইয়ের তাগিদে সে-লেখাটা উদ্ধার হ'লো। প'ড়ে মনে হ'লো নেহাৎই একটা খসড়া ব'লে বোধ হ'চ্ছে। আর ইতিমধ্যে 'ঘরে বাইরে' সম্পর্কে বোধ গভীরতর হ'য়েছে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। আর আমার লেখার ধাঁচও গেছে পাল্টে। তাই এই নতুন লেখাটি তৈরী হ'য়ে উঠল। — 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস বটে! কিন্তু এর এমনই আকর্ষণ যে বহুবার এটা নাটক রূপে অভিনীত হ'য়েছে—অন্য ভাষাতেও। পরে তো সিনেমাও হ'য়েছে। তাই নাটুকে আমার এই অনুসন্ধান এত জরুরী ব'লে মনে হ'লো। কেবলই সাহিত্যের আলোচনা করবার জন্যে নয়।]

ফ্রিৎজ্ বেনেভিৎজ্, আমি এবং ভার্জিনিয়া

সম্প্রতি ফ্রিৎজ্ বেনেভিৎজ্ কলকাতায় এসেছিলেন ব্রেশ্‌টের 'লাইফ্ অফ্ গালিলেও গালিলেই'র বাংলা অনুবাদ মঞ্চস্থ করতে। তাতে আমাকে গালিলেও-র মেয়ে ভার্জিনিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করতে হ'লো।

ভার্জিনিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করতে আমার কোনোদিন ইচ্ছে হয়নি। নাটকটা আগে একাধিকবার পড়েছি—একবারও মনে হয়নি ওর মধ্যে অভিনয় করবার মত কোনো জায়গা আছে। কিরকম বোকা-বোকা মতন একটা মেয়ে, ওর প্রতি আকর্ষণ হ'তে পারে এমন কোনো গুণই চরিত্রটির নেই। বরং মনে হ'য়েছিল কোনোদিন যদি এ নাটক হয়—আর কখনো কেউ যদি এই চরিত্রতে আমাকে অভিনয় করতে বলে আমি কিছুতেই অভিনয় করব না।

তবু যখন ক্যালকাটা রেপার্টারি থিয়েটারের পক্ষ থেকে আমাকে এই চরিত্রটি করতে বলা হ'লো আমি রাজী হ'য়ে গেলাম। সে-সময়ে জন্ডিস হ'য়েছিল—সম্পূর্ণ সারেনি তখনো, —সে সত্ত্বেও। এর দুটো কারণ ছিল—

(১) ফ্রিৎজ্ বেনেভিৎজ-এর কাজ দেখতে পাব। অনেকদিন আগে দিল্লীতে ন্যাশনাল স্কুল অফ্ ড্রামা-তে ওঁকে থ্রি পেনি অপেরা-র মহলা দেওয়াতে দেখে ওঁর সম্পর্কে অসীম আগ্রহ হ'য়েছিল।

(২) শম্ভু মিত্র গালিলেও-র ভূমিকায় অভিনয় করবেন—তাঁর সঙ্গে অভিনয় করতে পাবো এবং তাঁকে একটা অতবড় চরিত্র তৈরী করতে দেখতে পাবো। তিনি ব্যক্তিগত সম্পর্কে আমার পিতা, এবং বহুরূপী আর আমরা একই পরিবার ছিলাম। কিন্তু বাবা যখন বড় বড় চরিত্র তৈরী করেছে, বাড়ীতেই যখন মহলা চলত, তখন আমি নিতান্ত ছোট। আর বোঝবার এবং অনুভব করবার বয়সে যখন পৌঁছলাম বাবা তখন প্রযোজনার কাজ ছেড়ে দিয়েছে, পুরোণো নাটকগুলোই হ'তো। তাই এইটা আমার কাছে একটা বড় সুযোগ ব'লে মনে হ'লো। আর বাবার সঙ্গে অভিনয় করা আমার হয়ইনি বলতে গেলে। ফলে—এই লোভগুলো আমাকে ঐ অকিঞ্চিৎকর ভূমিকায় অভিনয় করতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

এর কিছুদিন পরের কথা বলি। দু'-আড়াই মাস বাদে যখন নাটক মঞ্চস্থ হ'তে চলেছে গতবছরে নভেম্বর মাসে, তখন একজন পরিচিত ফোন ক'রে আমাকে বললেন,—
—'আপনি গালিলেও-র মেয়ের পার্ট করছেন, না ? আপনি কি জানেন গালিলেও-র কোনো মেয়ে আদৌ ছিল না !' সত্যতা যাচাই করবার প্রয়োজন হয়নি। আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলাম—
—তবু ভাগ্যিস ব্রেশট্ সাহেব চরিত্রটা নাটকে রেখেছিলেন তাই আমি অভিনয় করতে পেলুম।
তখন আমি চরিত্রটাকে চিনেছি, আর ভালোবেসে ফেলেছি।

এই পরিবর্ত্তনটা যে ঘটল আমার মধ্যে তার জন্যে প্রধানতঃ কৃতজ্ঞ আমি ফ্রিৎজ্-এর কাছে, এবং বাবার কাছেও। বাবা, ফ্রিৎজ্ এবং আমি মাঝে মাঝেই এই চরিত্রটা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি। আমার কি মনে হয় বলেছি—ওঁরা বুঝিয়েছেন। ফ্রিৎজ্ তখন এমন সব সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন যাতে একটা চরিত্রের গল্প স্পষ্ট হয়। আর ক্রমশঃ তখন আমি আকৃষ্ট হ'য়েছি।

ফ্রিৎজ্-এর মতন এরকম পরিশ্রমী লোক খুব কম দেখা যায়। যখন মহলা চ'লছিল কি পরিশ্রম করতেন। ৯টা থেকে মহলা থাকলে তার বেশ আগেই উনি আসতেন। বাবা ঢুকলেই উঠে দাঁড়িয়ে প'ড়ে হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানাতেন। বাবা পৌঁছে গেছেন অথচ ফ্রিৎজ্ নেই—এইরকমটি প্রায় ঘটেনি।
সেই সকালে তখন আগের দিনের কাজের বা সেদিনের রাখা কাজের সম্পর্কে কিছু আলোচনা ক'রে নিয়ে মহলা শুরু হ'তো।
মহলা শুরু হ'লেই বেশ বোঝা যেত—কাকে কি বলবেন, কোন কাজটার ওপরে জোর দেবেন সবটাই ওঁর খুব ভালো ক'রে ভাবা। তখন মনে হ'তো সমস্ত দিনের কাজের শেষে উনি যখন রামকৃষ্ণ মিশনের অতিথি আবাসে ফিরে যান তখনো কাজ করেন। পরের দিনের ভাবনাটা তখনই বোধহয় উনি ভেবে রাখেন। অনেক আগে থেকে কবে কোন্ সময়ে কোন্ দৃশ্যের মহলা হবে এসব চার্ট তৈরী ক'রে টাঙানো থাকত—যাতে সংশ্লিষ্ট সবাই জানতে পারে কখন তাদের কাজ।

এমন ঘটনাও ঘটেছে—কম হ'লেও ঘটেছে— কোনো দৃশ্যের মহলা শুরু হবে, বিশেষ লোকজন নেই। প্রত্যেক দৃশ্যের মঞ্চসজ্জা কেমন হবে তা উনি প্রথমদিনই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মত কোথায় চেয়ার রাখা হবে, কোথায় বেঞ্চ, কোথায় টেবিল— সেসব সাজাতে হবে। উনি কাউকে কিছু না ব'লে নিজেই ভারী ভারী চেয়ার টেবিল বেঞ্চ খাটিয়া সব সাজাতে শুরু ক'রে দিলেন। আমার লজ্জা করত। একদিন সাহায্য করতে গেছি। বললেন,
No, no, you are there to act— not to do these things.

কিছুতেই করতে দিলেন না।
ক্রমশঃ সবাই সচেতন হ'য়ে উঠেছিলেন যাতে ওঁকে করতে না হয়।
একটা চোখ কাজ করত না ভদ্রলোকের। অপর চোখটাও ভালো নয়। বয়সও কম নয়। অথচ যখনই বসেন পিঠ সোজা ক'রে বসেন। ওখানে আমরা যতজন ছিলুম— ছ'টা নিয়মিত থিয়েটারের দলের লোক, বাবা এবং আমি (আমরা দুজনে তখন কোনো সংস্থার সঙ্গে যুক্ত নই)—
এর মধ্যে সবচেয়ে বেশী বয়স ছিল বাবার— তারপরই ফ্রিৎজের। এইরকমই আমার আন্দাজ। এঁরা দুজন ছাড়া সবসময়ে পিঠ সোজা ক'রে ব'সে থাকতে আমি কাউকে দেখিনি। আমার খুব অবাক লাগত।
ফ্রিৎজ্ যখন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নানারকম ভঙ্গী দেখাতেন আশ্চর্য হ'য়ে দেখতুম। ওঁর বোঝানোর ভঙ্গীটাও ছিল বড় সুন্দর।
আমার একটা অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে যাবার দৃশ্য ছিল। সেখানে ওঁর পরিকল্পনাটা ছিল আমি মাটিতে প'ড়ে যাবার ঠিক আগেই দুজন এসে আমাকে ধ'রে ফেলবে এবং মঞ্চের বাইরে নিয়ে যাবে। এটা যখন উনি দেখাচ্ছিলেন এত সহজ ভাবে হ'য়ে যাচ্ছিল! সেটা আমাদের তৈরী করতে কত সময় লাগল।
তারপর ধরা যাক— নীচু হ'য়ে অভিবাদন জানানো। ছেলেরা কেমন ক'রে করছে, মেয়েরা কেমন ক'রে করছে, গীর্জার সাধুরা একরকম, সাধারণ মানুষ একরকম— আমার একরকম। কোর্ট লেডিজ্দের আবার আরেকরকম।

কত তাড়াতাড়ি আমাদের ভাষার ধরণটা উনি বুঝে নিয়েছিলেন। উনি যে-কথাটার ওপর জোর দিতে চাইছেন সেটা না হ'লে বেশীরভাগ সময়েই উনি বুঝতে পারতেন। আমার এত আশ্চর্য্য লাগত।

বাবার অভিনয় দেখে কিরকম মুগ্ধ হ'য়ে যেতেন। শেষ দৃশ্যে বাবার অনেকখানি কথা। বাবা অনেকসময়েই ঐ অংশটা ছোট করার কথা বলতেন। বলতেন, 'বড্ড বেশী কথা একসঙ্গে, লোকের খারাপ লাগবে।'
ফ্রিৎজ্ উত্তরে বলতেন— 'Though I do not understand the language I could sit for an hour more and listen to you like that.'
ভাষাটা উনি কেমন ক'রে আন্দাজ করলেন সেটা সত্যিই বিস্ময়ের। অল্প স্বল্প সংলাপে কেউ একটা বাক্য বাদ দিলে উনি ইংরিজিতে সংলাপটা ব'লে দিতেন— যে-বাক্যটা বাদ প'ড়েছে।

মাত্রই তো একমাস ছিলেন। কি সামান্য বেশী হয়তো। ঐ সময়ের মধ্যে এতগুলো দৃশ্যের মোটামুটি খসড়া কিভাবে তৈরী ক'রে ফেললেন সত্যিই আশ্চর্য্যের।

বাবা সকাল ৯টা থেকে ১২টা/ ১২॥টা পর্য্যন্ত মহলা দিয়ে বাড়ীতে খেতে যেতেন। আবার বিকেলে ৪॥টে থেকে ৬॥টা/ ৭টা পর্যন্ত মহলা দিতেন। আমিও প্রায় তাই-ই করতুম। কারণ, ঐ যে, জন্ডিস তখনো সারেনি, বাইরে কিছু খাওয়া অসম্ভব ছিল, সামান্য বিশ্রামেরও প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া বাবার

সঙ্গে ছাড়া অন্য লোকের সঙ্গে আমার খুব কম দৃশ্য ছিল।
কিন্তু ফ্রিৎজ্ তো থাকতেনই। সেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত—ক্লান্তিহীন। সেট্ লাইট্ গান-ইত্যাদি কোনো না কোনো কাজ চলছেই। কিছুই প্রায় খেতেন না। দুটো সন্দেশ আর কলা এই ছিল দ্বিপ্রাহরিক খাবার। আর বরফ দেওয়া লেবুর জল খেতেন। বোধ করি এই জন্যই এই গরমের দেশে অত খাটতে পারতেন।
লোডশেডিং হ'য়ে গেলে সকলেরই মুখ দিয়ে একটা— 'ওঃ!' কিংবা 'গেল!' এরকম বেরোতো। উনি যেন খেয়ালও করতেন না। পাখাটা নেই ব'লে যে কষ্ট হ'চ্ছে (কষ্ট তো নিশ্চয়ই খুবই হ'ত) প্রকাশও করতেন না তা! আবার আলো এসে গেলেও কোনো হাঁফ ছাড়ার অভিব্যক্তি নেই। যেন কিছুতেই কিছু এসে যায় না।
প্রথমেই দৃশ্যের কমপোজিশন ক'রে ফেলতেন। চরিত্রগুলো কোথায় দাঁড়াচ্ছে, কোথায় বসছে, কি কাজ করতে করতে কথা বলছে। সবই প্রথমেই বুঝিয়ে দেওয়া, তারপর ধীরে ধীরে মাজাঘষা করা।

প্রথমদিনই আমাকে বললেন, 'তুমি পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ে, সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। তুমি বাবার তৈরি দূরবীনটা সভায় দিতে এসেছ। ভীষণ গর্বিত ঐরকম একটা কাজ পেয়ে। দূরবীনের নলটা একটা ভেলভেটের বালিশের ওপরে থাকবে, সেটা হাতে নিয়ে খুব সচেতন হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছ,—কখন সময় হবে এবং মাননীয় দোজের হাতে তুমি ওটা তুলে দেবে।' ঐ চুপ ক'রে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাটা— সেইটা দেখাতেই আমার খুব মজা লাগল।— তারপর সময় হ'লে কিরকম ক'রে এগিয়ে যেতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে ওটা দোজের হাতে দিয়েই— ব্যাস্ কর্ত্তব্য সমাপন হ'য়ে গেছে —বাব্বাঃ বাঁচা গেছে —আর সভা মনে রইল না, লোকজন মনে রইল না — দৌড়ে প্রেমিকের কাছে গিয়ে দাঁড়ানো— ভাবখানা— 'কেমন করলুম!' তারপরও বেশ কিছুটা সময় ধ'রে মঞ্চের অন্য কার্যাবলীর প্রতিক্রিয়া। দৃশ্যের একেবারে শেষের দিকে দুটো কি তিনটে ছোট্ট ছোট্ট কথা। কিছুই নয়। কিন্তু উনি যখন দেখালেন এত মজা লাগল।
তারপরের দৃশ্যে ভোররাত্তিরে উঠে গীর্জায় যাবে ভার্জিনিয়া। বাবাকে সুপ্রভাত জানাতে এসেছে। গালিলেও দূরবীন দিয়ে রাতভোর আকাশের তারা দেখে চলেছে, সঙ্গে সাগ্রেদো। ভার্জিনিয়া আসবার একটু আগেই গালিলেও একটা দারুণ আবিষ্কার করেছে— বৃহস্পতির উপগ্রহ। ছোট্ট আন্দ্রেয়াকে তা দেখানোর জন্য গালিলেও অস্থির হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু ভার্জিনিয়া এমন বেচারী—সে বাবাকে জিজ্ঞাসা করে,—
'রাত্তিরটা কেমন ছিল?'
'পরিষ্কার।'
তার মানে তারা দেখা গেছে! সে উত্তেজিত হ'য়ে বলে,—
'এটা দিয়ে একটু দেখব?' দূরবীনটা দেখায় সে।
বাবা কঠিন গলায় বলে,—

—'এটা খেলনা নয়।'
ও কেমন হ'য়ে যায়। হাত দিয়ে চোখটা একটু মুছে নেয়। বাবার রূঢ় ব্যবহারে বড় কষ্ট হয়। তারপর আবার কিন্তু জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কিছু দেখতে পেয়েছ ?'
বাবা উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ—কিন্তু তোমার ভালোলাগার মত কিছু নয়।'
কি বেচারী মেয়েটা।
তারপর বাবার একটা আমন্ত্রণসূচক কথায় সে যখন খুশী হ'য়ে একটা মতামত দিতে যায় বাবা আরও কঠিন হ'য়ে বলে,—
—'যা, যা— গীর্জেয় যা।'
সরল মেয়েটার ঠোঁট ফুলিয়ে কান্না পায়—সে তাড়াতাড়ি চ'লে যায় মঞ্চ থেকে।
এইরকম ক'রে ক্রমশঃ ক্রমশঃ চরিত্রটাকে আবিষ্কার করতে লাগলাম। এবং এত খুঁটিনাটি সব ফ্রিৎজ্ আমাকে বুঝিয়েছিলেন।

ভার্জিনিয়ার বিয়েটা ভেঙে যায়, সেও বাবার জেদে। তারপর মেয়েটা পালটে যায়— একেবারে পালটে যায়। অনেক বছর কেটেও গেছে, একটু বয়স হ'য়ে গেছে ভার্জিনিয়ার। বাবা বুড়ো হ'য়ে গেছে। যে-বাবার জন্য সে সংসার পায়নি, যে-বাবার কাছ থেকে কেবল অবহেলাই পেয়েছে সেই বাবাকে সে কেমন যত্ন করে, ভয়ে ভয়ে থাকে পাছে বাবার কষ্ট হয়।
দশ নম্বর দৃশ্যে বাপ আর মেয়ের বেঞ্চিতে ব'সে একটা অপেক্ষার দৃশ্য ছিল। বাবা বোধহয় রোজ ভোরবেলায় উঠে উঠে গীর্জায় যাবার কারণে এবং এত পরিশ্রমের কারণে মেয়ের শরীর ভাঙছে লক্ষ্য ক'রে তাই নিয়ে বকে।
আর মেয়ে চোখ তুলে কেবল তাকায়, তাকিয়ে থাকে। বাবা যেন সে দৃষ্টিতে কত ব্যথা, কত অনুযোগ, কত একাকিত্ব দেখতে পায়, চোখ দুটো কেমন হ'য়ে যায়। মুখ ফিরিয়ে নেয় বাপ। মেয়েরও তখন ঐ বাপের ওপরে আবার মায়া হয়। সে বিপরীত দিকে মুখ ফেরায়। এই নীরব অভিনয়টা দর্শককে খুব নাড়া দিত দেখেছি। কেবল চোখেই অনেককিছু প্রকাশ করা।

কর্তৃপক্ষের ব্যবহার যখন অসম্মানজনক যতক্ষণ পারে সেটা সে বাবাকে জানতে দেয় না। তারপর বাবা যখন বন্দী তখন একমনে প্রার্থনা ক'রে যায়। 'Ave maria Gratia ......'। এই দৃশ্যটা যে এইভাবে কল্পনা করা যায় নাটকটা প'ড়ে কোনোদিন ভাবতে পারিনি। কেবল ভার্জিনিয়ার প্রার্থনার আওয়াজের ওঠাপড়া দিয়ে কি অসাধারণ মুহূর্ত্ত তৈরী করবার প্রয়াস। গালিলেও মত প্রত্যাহার ক'রেছেন ব'লে সমস্ত ছাত্রের দল যখন ক্ষুব্ধ, ভার্জিনিয়া চোখের জলের মধ্যে খুশী হ'য়ে বলে,— "ওরা বাবাকে শাস্তি দেয়নি !" এতক্ষণের প্রার্থনায় ওটাই তার একমাত্র কাম্য ছিল।

এরপর শেষ দৃশ্য। তখন ভার্জিনিয়ার বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। তখনই যেন তার চুলে রুপোলি রেখা, মুখে ভাঁজ, চোখের কোল দুটো বসা। সে

কিরকম যন্ত্রের মত কাজ ক'রে যায়। ফ্রিৎজ্ বলেন, ব্রেশ্ট নাকি বলেছিলেন, এই সময়ে ভার্জিনিয়া অনেক বেশী সুন্দরী হ'য়ে উঠেছে। Spiritual beauty-র অধিকারিণী সে। বাবার সঙ্গে বন্দী জীবনযাপন করে, বাবাকে আগলায় এবং মনে মনে বুঝি কেবলই বলে, 'ave maria, ave maria ...'। মনকে তার এমনি ক'রেই বোধ ক'রি শান্ত রাখতে হয়। আন্দ্রেয়াকে একেবারে শেষকালে সে বলে,

—'অতীত থেকে কোনো লোক আসে আমরা চাই না, এতে বাবা উত্তেজিত হন।'

এই অতি বৃদ্ধ বয়সে কি প্রয়োজন বাবাকে নাড়া দিয়ে? আবার বিপদে ফেলে? একে বাবা গীর্জার বন্দী। চোখে দেখতে পায় না প্রায় কিছুই। এর ওপরে আরো বিপদ কেন ডেকে আনা? সে আগলাতে চায়।

আন্দ্রেয়ার আগমন তো তারও মনকে নাড়া দিয়েছে। হয়তো আবার তার সব পুরোণো কথা মনে পড়েছে—তার প্রেমের কথা, তার হাসিখুশী ছোটবেলার কথা,— কিন্তু নিজেকে সামলে সে আবার তার প্রাত্যহিক কাজে ফিরে যেতে চায়। এইখানে নাটকের একদম শেষটায় দেখা যায় বাবা এবং মেয়ে দুজনে একসঙ্গে থেকেও আলাদা দুটো বৃত্তে বাস করে, এবং দুজনে কী ভীষণ একাকিত্ব দিয়ে ঘেরা। ভার্জিনিয়ার এই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনটা, এবং ক্রমশঃ এই ভয়ানক একাকিত্বের মুখোমুখি হ'য়ে বেঁচে থাকাটা— এইটা বুঝতে পারবার পর ভার্জিনিয়া আমার খুব কাছের মানুষ হ'য়ে উঠল। যেন সে আমারই একটা অংশ।

গালিলেও-ও একা —কিন্তু তার জন্যে সে নিজে অনেকাংশে দায়ী,—তার বৈজ্ঞানিক আধুনিক মনোবৃত্তি এবং সেই সঙ্গে তার স্বভাবও। ভার্জিনিয়ার এই ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য সে কিন্তু নিজে কোনোভাবেই দায়ী নয়, তাই এত মর্মান্তিক।

বিশ্লেষণটায় এই পুরো চরিত্রটাকে এইরকম ভাবে দেখতে পেয়ে আমি মুগ্ধ হ'য়েছিলুম। তাই ভার্জিনিয়া আমারই একটা অংশ হ'য়ে উঠেছিল যেন। আর তাই ঐ ভদ্রলোককে বলেছিলাম—

—'ভাগ্যিস ব্রেশ্ট সাহেব চরিত্রটা নাটকে রেখেছিলেন! তাইতো আমি অভিনয় করতে পেলাম!'

[৮০-এর দশকের গোড়ায় ক্যালকাটা রেপার্টারি থিয়েটাব-এর প্রযোজনায় ফ্রিৎজ্ বেনেভিৎজ্-এর নির্দেশনায় কলকাতায় ব্রেশটের 'লাইফ অফ গালিলেও গালিলেই'র বাংলা অনুবাদ মঞ্চস্থ হয়। তার পরপরই জামশেদপুরের একটি নাট্যপত্রিকার অনুরোধে এটি লেখা হয়।]

কিছু এলোমেলো ভাবনা

কিছু এলোমেলো চিন্তা আমরা করি ! মানে যেমন ক'রেই থাকি—রোজই। যেহেতু প্রধান কাজ দাঁড়িয়েছে থিয়েটার তাই ভাবনাগুলো ঘুরে ফিরে ঐ থিয়েটারেই চ'লে আসে। আর আমার প্রধানতম কাজ তো অভিনয়— তাই ভাবনাটা এই রকম দাঁড়ায়— নিজেকে প্রকাশ করব কি ক'রে অভিনয়ের মাধ্যমে। মানুষের জটিল সমস্যা— তার আবেগের জটিলতা— এগুলো প্রকাশ করতে না পারলে তো শিল্প হয় না। খুব বেশীদিন হয়নি— আমার নিকট আত্মীয়ার স্বামী মারা গেলেন। খুব অল্প বয়সে বিয়ে হ'য়েছিল, তাই দিদিমা হ'য়ে গেছেন, কিন্তু অত্যন্ত সুন্দরী ব'লে দেখে মনে হ'তে পারে— 'এঁর তো এখনো বিয়ে হ'তে পারে !' এঁদের প্রেম ছিল আবাল্যের। যুদ্ধ জীবনে কম করতে হয়নি। প্রায় সমস্ত জীবনের মত ওঠা-পড়া, সুখ-দুঃখ, বিপদ-শান্তি সবের মধ্যে দিয়ে ঝড়ঝাপটা স'য়ে এতগুলো বছর একসঙ্গে পার হ'য়েছেন ! হঠাৎ— কয়েক ঘন্টা —ব্যাস্, স্বামী নেই। সেই স্ত্রীর চোখ দিয়ে জল পড়ল না। কারো সহানুভূতি উদ্রেক করার চেষ্টা তো দূরে থাক—খুব স্বাভাবিক ব্যবহার করার চেষ্টা। অথচ তিনি যে কষ্ট পাচ্ছেন, কতকিছুই যে মনে পড়ছে তাঁর, সেটা অনুভব করা যাচ্ছিল।
হাসপাতালে মারা গিয়েছিলেন স্বামী। যখন দেহ নিয়ে বাড়ীতে ফিরল সবাই, তখন বোধহয় রাত তিনটে ! শীত ! সেটা ডিসেম্বর মাস ! যে ঘরটিতে তাঁকে শোয়ানো হ'লো স্ত্রী চুপটি ক'রে সেই ঘরে মাথার কাছে গিয়ে ব'সলেন, মাঝে মাঝে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন, আর কেবল চেয়ে রইলেন স্বামীর মুখের দিকে। ছোট ছোট নাতনী দু'টি —তারা সর্বনাশ বুঝতে পারছিল না— হাসছিল, খেলছিল। উনি একবার মুখ তুলে বললেন,
—'ওদের গোলমাল করতে বারণ করো, পাড়ার লোকের অসুবিধা হবে।'
মেয়েরা রৈ রাই ক'রে কাঁদছে, জামাই দু'জন কাঁদছে, ভদ্রমহিলার বোনেরা কাঁদছে।
ইনি কেবল চুপ, যেন খুব স্বাভাবিক।

আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। বেরিয়ে পড়লাম আত্মীয়স্বজনকে খবর দিতে।

যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে ব'লে দেহ উঠোনে রাখা হ'য়েছে, সবাই ঘিরে দাঁড়িয়েছে, গাড়ীতে তোলা হবে খাট,— স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছেন, তেমনিই চুপটি ক'রে তাকিয়ে। যখন খাটটা তুলে নিয়ে চ'লে গেল ওরা, তখন তাঁর মাথাটা বোধহয় একটু ঘুরে গেল। আমি কাছেই ছিলাম, আরো দু'একজন মহিলা ছিলেন— সবাই ধরলাম। খাট উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় চ'লে গেল গাড়ীর দিকে— তিনি আবার নিজেকে সামলে শান্ত হ'য়ে ফিরে এলেন ঘরে, বাড়ীতে ঢুকেই কল খুলে পা-টা ধুলেন, গামছা দিয়ে মুছলেন— তারপর ফের দেহটা থাকাকালীন যেখানে ব'সেছিলেন সেখানে চুপটি ক'রে ব'সে রইলেন।

এই যে নিজের শোকটা নিজেব মধ্যে চেপে তাকে বারোয়ারী না ক'রে কষ্ট ক'রে সহ্য ক'রে যাওয়া, এতে মানুষের একটা মহত্ব প্রকাশ পায়। তাকে আমার প্রণাম জানাতে ইচ্ছে করে।
সাধারণ ভাবে আমরা তো সবাই তুচ্ছ— কিন্তু এই এক-একটা ক্ষেত্রে, এক-একটা ব্যবহারে মানুষ মহৎ হ'য়ে ওঠে।

এই যে ঘটনাটি বললাম কোন স্তরের অভিনয়ে এই কিছুই প্রকাশ না করার জটিলতাটা প্রকাশ করা যাবে ? ঐ-টা তো সত্যি—আর আমরা তো চাই সত্য অনুভবটাকে প্রকাশ করতে, জীবনের জটিলতাটাকে প্রকাশ করতে ! কিন্তু কি নিদারুণ শক্ত এই কাজ আশা করছি ওপরের ঘটনাটি ব'লে বোঝাতে পেরেছি ! প্রকাশ করব বললেই প্রকাশ করা যায় না। তার জন্যে অনেক স্তরে নিজেকে তৈরী করার প্রয়োজন ! অনেকগুলো ভাবনা আছে। আমার গলার আওয়াজ কি ঐ জটিল অনুভবকে প্রকাশ করতে সক্ষম ? আমার ফিরে দাঁড়িয়ে থাকাটা কি একটা নিঃস্ব, রিক্ত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে ? আমি কি সেইভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছি ? হঠাৎ মাথাটা ঘুরে যাওয়া— এটা কি আমার শরীর আমার অভিব্যক্তি দিয়ে একটুও বাড়াবাড়ি না ক'রে প্রকাশ করতে পারব ? আমার অভিনয়ে মনে করাতে পারব কি যে আমি চুপ ক'রে থাকলেও ভেতরে আমার তোলপাড় হ'চ্ছে ? এই যে—ভেতর এবং বাইরেটা—অর্থাৎ গভীর অনুভব, বোধ এবং প্রকাশভঙ্গী—এই সবটা মিলিয়ে তো অভিনয় শিল্প হ'য়ে ওঠে !

প্রশ্ন জাগে,— আমরা সবাই কি এমন ক'রে অভিনয় নিয়ে ভাবছি ? এই যে হাজারো বই প'ড়ে প'ড়ে বিভিন্ন অবস্থাকে কল্পনা ক'রে এবং পারিপার্শ্বিক ঘটনা লক্ষ্য ক'রে নিজের বোধকে বাড়ানো, নিজেকে গভীর ক'রে তোলা—এটা যেমন দরকার, তেমনিই তো দরকার এই বোধটাকে প্রকাশ করবার জন্য যে যন্ত্র— আমার শরীর, আমার গলার আওয়াজ তাকে প্রকাশক্ষম ক'রে তোলা। এমন মুশকিল, যে, যন্ত্রটা হ'চ্ছে আমার শরীর— সেটা কেমন দেখতে আমি সঠিক জানি না ; আমার গলার আওয়াজ— সেটা কেমন শুনতে আমি সঠিক জানি না। তবু, তারই মাধ্যমে আমাকে প্রকাশ করতে হবে ! কি কষ্ট ! কি

অসম্ভব শক্ত একটা ব্যাপার ! তবু তাকেই বরণ ক'রে নেওয়া ।
এ সাহিত্য নয়—-যে থাকবে— এ যুগের পরের যুগ, তার পরের যুগ—লোকে পড়বে ভাববে । এ সিনেমা নয়— সেলুলয়েডে ধরা থাকবে এই প্রচেষ্টা । এটা একটা তাৎক্ষণিক সৃষ্টি, তক্ষুনি মিলিয়ে যাবে । যদি খুব ভালো কিছু করতে পারি কিছু লোকের মনে থাকবে—কিন্তু কিছুদিন পরে তারাও প্রকাশ করতে পারবে না কি ভালো, কেন ভালো ।
কিন্তু তবু কাজ ক'রি । তবু ভাবি । তবু নিরন্তর এই চেষ্টা । পাই, না-পাই, নাম থাক বা না-থাক, —এসব কিছুর বাইরের কোনো একটা বোধ, কোনো একটা তাগিদ আমাকে দিয়ে ভাবায়, কাজ করায় । না ক'রে যেন আমার বাঁচারই উপায় নেই !!

[৮০-র দশকে প্রকাশিত । প্রথমে সম্ভবতঃ আগরতলার 'ত্রিপুরা দর্পণে' প্রকাশিত হয় । পরে বাঁকুড়ার ও কলকাতার দুটি পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হ'য়েছিল ।]

কেন অভিনয় করি ?

মাঝে মাঝেই এ প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয় আমাকে, আজও—'অভিনয় করবেন এইটা ভাবলেন কেন ?' যদিও আমার পক্ষে এইরকম কাজ করাটাই স্বাভাবিক— আমি এক থিয়েটার-পরিবারের মেয়ে ! তবুও এই প্রশ্ন করেন, অনেকেই।

আমি যদি ডাক্তার বা প্রযুক্তিবিদ্ হ'তাম তাহলেই বরং প্রশ্ন করবার ছিল থিয়েটারে না এসে এসব দিকে কেন ?

তবে এ কথাটাও ঠিক যে, কেবল পারিবারিক কারণেই আমি এই কাজ করতে আসিনি। আর আমার বাবা কিংবা মা কেউই এ কাজ করতে আমাকে বাধ্য করেননি। আমার যা ইচ্ছে হবে তাই-ই আমি করব— এমনই ছিল বাড়ীর ভাবখানা। তবু থিয়েটার করব ব'লে যে ঠিক করলাম সে আমার নিজেরই সিদ্ধান্ত।

আমার কৈশোরে আমি কয়েক বছর শয্যাশায়ী ছিলাম। শুনেছিলাম সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে ওঠার সম্ভাবনা কমই ছিল। তা সেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে তখন বই পড়বার অখণ্ড অবসর। আর নানা বই পড়তে পড়তে থিয়েটারটা আমাকে টানতে লাগল। কেন যে এমন হ'লো ! মনে আফশোষ হ'তো— থিয়েটার করবার সখই হয় কেন ? কেন নাচতেই ইচ্ছে হয় ? বরং যদি একটু লিখতে পারতাম ! সেই ক্ষমতা থাকলে তো শুয়ে, আধশোয়া হ'য়ে, করা যেত কাজ কিছু। কিংবা যদি আঁকবার হাত থাকত ! উঃ ! তাহলে তো ধরাকে সরা জ্ঞান করতে পারতাম। কিন্তু যেটা করতে ইচ্ছে করে তা করতে গেলে পায়ের ওপরে দাঁড়াতেই হবে, উপায় নেই !

আমি 'নাটক' বিষয়ে অনার্স নিয়ে পড়তে শুরু করেছি। যখন পরীক্ষা দিতে গিয়েছি, পার্ট ওয়ান, তখনও বিছানাপত্তর নিয়ে শুয়ে শুয়ে পরীক্ষা দেওয়া।

সেদিন প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষা ছিল মাইম্-এর। ভেবেছিলাম কিছুই তো পারব না ভালো ক'রে, তবু যদি কিছু দেখাতে পারি পাঁচটা নম্বরও তো মিলবে ! প্রশ্নপত্রটা প'ড়ে দেখি প্রত্যেকটা কাজই দাঁড়িয়ে হেঁটে দেখাতে হবে। অথচ তখন তো আমি কারো সাহায্য ছাড়া দাঁড়াতেও পারি না, হাঁটতেও পারি না ! একটা প্রশ্নের অর্দ্ধেক অংশে ব'সে অভিনয় দেখানোর সুযোগ ছিল। আমি

সেই লেজটুকু ধ'রে পরীক্ষা-সমুদ্র পার হ'তে চাইলুম।
তখন আবার একটা বেশ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হ'লো। মনে হ'লো অভিনয় কি ক'রে হবে আমার দ্বারা? আর দীর্ঘকাল ছাড়াছাড়ির ফলে গলাও বলে না। সে কোনোদিন ঠিক হবে কি না তখন তো জানি না।— তখন কোনো কোনো সময়ে একটা সংগঠনের কথা ভাবতুম, একটা শিক্ষালয়.— সেখানে অমুক এই বিষয়ে পড়াবে, তমুক এই শেখাবে— তাতে অনেক শিক্ষিত ছেলেমেয়ে পেলে বাবার কাজ করতে সুবিধা হবে। আমি তো আর কিছু পারব না, এইটার সাংগঠনিক কাজগুলো করব! আমার এক—তুতো-দাদাকে বলেছিলামও বোধহয়,— 'ছোড়দা, আমি তো মাঝে মাঝে শুয়ে পড়ব, তুই আমাকে সাহায্য করবি?' স্তানিস্লাভ্স্কির 'মাই লাইফ ইন আর্ট' প'ড়ে তখন আমার মাথায় সারাক্ষণ এই স্বপ্ন!

এখন ভাবতে বেশ মজা লাগে যে, যেই কিঞ্চিৎ ভালো হ'লুম অমনি গলা তৈরী করবার নেশা পেয়ে বসল আমাকে।

তারপর সবে যখন নাটক করা শুরু করেছি, তখনো ঠিক সুস্থ ন'ই— সাত তাড়াতাড়ি স্কলারশিপের আবেদন করলুম। আর ভাগ্যক্রমে পেয়েও গেলুম শেষ পর্যন্ত জাতীয়বৃত্তি। 'ভাগ্য' তো অনেকরকম রূপ দেখায় নিজের! আমি দু-দুজন অসামান্য থিয়েটার-ব্যক্তিত্বের সন্তান ব'লে আমাকে অনেক বিরূপতা সহ্য করতে হ'য়েছে, এখনো হ'য়ে থাকে। তাই বললুম 'ভাগ্যক্রমে' শেষপর্য্যন্ত পেয়েও গেলুম!

যদিও অনেক সঙ্গীতজ্ঞ আমার ছেলেবেলায় বলেছিলেন আমার গলা বেসুরো, আমার দ্বারা গান হবে না— তবুও, এইসব শোনার পরেও, এ হেন আমি প্রাণপণে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত শিখতে লাগলুম। উচ্চাঙ্গসঙ্গীত গাইব এই দুরাশায় নয়, গলাটা তৈরী করবার জন্য।

কেন? এমন তাড়না?

তখনো কিন্তু মাঝে মাঝেই শয্যাশায়ী থাকতে হয়— হযতো কয়েক মাস ধ'রে,— পিছিয়ে যাই। —আবার উঠে নতুন উদ্যমে শুরু ক'রি।

এই সময়ে 'রবিতীর্থ' ইস্কুলে ভর্ত্তি হ'য়েছিলুম। স্বনামধন্যা শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রর গানের স্কুলে। সামান্য দিন শিখেছিলুম সুচিত্রাদির কাছে। দেড়বছর মতন। যা পেয়েছি তা আছে আমার মনে—তার মূল্য আমিই জানি কেবল। কিন্তু এইরকম শরীরে কেবলই অনিয়মিত হ'য়ে সেটা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। ছেড়ে দিতে হ'লো। এ আমার জীবনে বড় দুঃখের ঘটনা।

এই সময়তেই, এই 'কিংবদন্তী' 'পাগলা ঘোড়া'র সময়তে, অনেকবার বলতে হ'য়েছে আমাকে কেন আমি অভিনয় করতে এলুম! কেন অভিনয় ক'রি? সত্যি, কেন ক'রি? অভিনয়ই কেন ক'রি?

তখন, উত্তর দিতে গিয়ে ভেবে ভেবে মনে হ'য়েছিল, নিজেকেই বোঝবার চেষ্টা ক'রে— শিল্পের বিভিন্ন দিক তো মানুষের নিজেকে প্রকাশ করার মাধ্যম। অভিনয়ের মাধ্যমে আমি হয়তো নিজেকে বেশী প্রকাশ করতে পারি—তাই

ক'রি। আবার এ কথাও তখন মনে হ'য়েছিল, প্রায় বছর কুড়ি আগে, যখন 'রাজা'-তে সুরঙ্গমা করেছি, 'পাগলা ঘোড়া'-র পরপর—
অভিনয় করতে গিয়ে এমন এমন চরিত্র তো করতে হ'তে পারে, যারা মাপে অনেক বড়। তখন তাদের ছোঁবার চেষ্টা ক'রে আমারও তো কোথাও বদল হবে! আর আমার জীবনে যেসব অভিজ্ঞতা হবার সম্ভাবনা নেই-ই, অভিনয়ের সূত্রে সেই অভিজ্ঞতাটাকে অনুভব করার চেষ্টা করতেই হবে— হয়— তাই বোধহয় অভিনয় করবার জন্যে নিজের ভেতরে এত তাড়না অনুভব ক'রি। এই যে নতুন নতুন অনুভব, এই যে 'ভালো'-কে অনুভব করতে পারা—এসবই তো দিচ্ছে আমাকে নাটক, থিয়েটার—তাই অভিনয় করি!

এ সেই বছর কুড়ি আগের অনুভব। তারপর একসময়ে, এর আট-দশ বছর বাদে—যখন আমার অনেকরকম নাটকে অনেকরকম চরিত্রে অভিনয় করা হ'য়ে গেছে, 'ঘরে বাইরে'-তে বিমলার মত চরিত্রেও অভিনয় করেছি, যখন ইয়োনেস্কোর নাটকও অনুবাদ করেছি, তারমধ্যে একটি মঞ্চস্থ হ'য়েছে— এই সবের পর—একটা অন্য অনুভব হ'লো।
আমি সেইসময়ে 'দশচক্র' নাটকে ডাঃ গুহ-র মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করছি কিছুদিন ধ'রে। 'এ্যান্ এনিমি অফ দ্য পীপল্-'এর (ইবসেনের) বাংলা রূপান্তর 'দশচক্রে' ঐ মেয়ে মঞ্জুর ভূমিকাটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তবুও প্রত্যেকদিন অভিনয়ের পরে, এমন কি মহলার পরেও নিজেকে সার্থক মনে হ'তো। তখন আবার প্রশ্ন এল,— কেন? কেন এত সার্থক মনে হয়? যেখানে নিজের অভিনয় দেখানোর তেমন সুযোগ নেই, চরিত্রটা তেমন জটিল নয়, সেটা ক'রে এত সার্থক লাগে কেন?
তখন ক্রমশঃ কেমন অনুভব করলাম যে কেবল কোনো চরিত্রেই নয়, সমগ্র থিয়েটারের কাজের মধ্যেই লুকিয়ে আছে অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির স্তর গভীরতর করবার উপাদান। এবং তা না হ'লে, অর্থাৎ সেই মাপের নাটক না হ'লে,—যেখানে কিছু বলবার কথা আছে, সমাজের প্রতি আমার দায় পালন করবার উপায় আছে, সেইরকম নাটক না হ'লে আমার অভিনয় করতে আগ্রহ হবে না। একটু ব্যাখ্যা ক'রে বলতে গেলে বলতে হয়— অভিনয় করতে গেলে নানারকম চরিত্র তো করতে ইচ্ছে করে! হয়তো একটা চরিত্র পেয়ে মনে হ'লো বেশ ভালো চরিত্র! কিন্তু কিছুদিন করবার পরে দেখা গেল আর চরিত্রটা থেকে কিছু বেরোচ্ছে না, নতুন কোনো স্তর প্রকাশ করা যাচ্ছে না! তখন বোঝা যায় যে সে-নাটকটার তেমন জোর নেই, তার মধ্যে মূল্যবান কিছু প্রকাশ করবার নেই। আর মহৎ নাটকে, বা এমন কোনো নাটকে যার মধ্যে একটি বলবার কথা আছে যা সত্য, অথবা চিরন্তন—তার মধ্যে নতুন নতুন স্তর আবিষ্কার করবার সুযোগ পাওয়া যায়। নতুন মানে বেরোয়। সেইসব নাটকের সঙ্গে যে-কোনোভাবে যুক্ত থাকলেই একটা সার্থকতার অনুভব হয়। আর অভিনয় করলে প্রায় প্রতিদিন নতুন ক'রে জীবন্ত হ'য়ে ওঠার উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়। আর সেইখানেই তো থিয়েটার তার আপন চরিত্রকে ব্যক্ত

করে। ঐ প্রতিদিন নতুন হ'য়ে ওঠাতে, ঐ প্রতিদিন নতুন স্তর প্রকাশ পাওয়াতে ! ঐ, ঐ জন্যেই থিয়েটারের কাজ এত মূল্যবান ব'লে বোধ হয়। ঐ জন্যেই থিয়েটার ক'রি।

আর দুর্ভাগ্যক্রমে ক্রমে ক্রমে পরিস্থিতি এমনই হ'লো যে, যে-অনুভব আমার কাম্য তার বিপরীত কোনো অনুভব ক্ষয় করতে থাকল আমাকে। আমার আগ্রহ হারিয়ে গেল। সেই আমার অন্তরের তাড়না আমাকে ছেড়ে কোথায় যে মুখ লুকোলো ! সবই যেন বড় অর্থহীন লাগতে লাগল আমার ! নিঃশ্বাসেও স্বস্তি নেই ! তাই থিয়েটার ছেড়ে দিলুম। '৭৯ সালে। থিয়েটার নিজ দায়িত্বে শুরু করবার দশবছর বাদে।

থিয়েটার ছাড়া অন্য অনেককিছু করছিলুম সে-সময়ে— আবৃত্তি, শ্রুতিনাট্য নিয়ে নিরীক্ষা, বেতারের জন্য গল্পের নাট্যরূপ দেওয়া, বেতারে অভিনয় করা, দূরদর্শনের জন্যও কিছু কিছু কাজকর্ম,— এইরকম নানানকিছু।

মাঝে অবশ্য ঐ সময়ে 'গালিলেও-র জীবন' নাটকে অভিনয় করেছিলুম। সেই অভিনয় করতে গিয়েও আমার এক মহৎ উপকার হ'লো— যখন কিছু করবার থাকে না তখন কি করতে হয় মঞ্চে ভার্জিনিয়ার ভূমিকায় করতে গিয়ে তার একটা মূল্যবান শিক্ষা হ'লো। আমি আবারও ধনী হ'লুম। কিন্তু এ তো আলাদা গপ্পো।
এখন প্রশ্ন হ'লো—'গালিলেও-র জীবন'-এর ঐ ক'দিনের অভিজ্ঞতা ছাড়া চার বছর তো থিয়েটার করিনি। —তবে ?

কি আশ্চর্য ! আবারও অনুভব করা গেল থিয়েটার টানছে আমাকে, আবার,—মূলতঃ অভিনয়। আমি অনুভব করছিলাম—আমি আমার চোখ, ভুরু, হাত, পা—সমস্ত কিছু ব্যবহার ক'রে নিজেকে প্রকাশ করতে পারি,—কিন্তু করছি না। আমি কেবল আমার স্বরটুকু ব্যবহার করছি।
মনে হ'লো, পথ একটা আবিষ্কার করতেই হবে, যে পথে নিজেকে সম্পূর্ণ মেলে ধরা যায়, নিজের বলবার কথা বলা যায়। কোনো নাটক তখন মনে ধ'রছিল না। কেবলই ঐ, একটা তাড়না—আবারও ঐ তাড়না !

তাগিদটা এতটাই প্রবল হ'য়ে উঠল যে, যে-আমি কোনোদিন তেমন কিছু লিখিনি তাকে কাগজকলম নিয়ে বসতে হ'লো ! যে লিখতে পারে না ব'লে কত হা-হুতাশ করেছে শুয়ে শুয়ে একসময়ে, তার এতটাই ধৃষ্টতা হ'লো যে সে ব'সে গেল কাগজকলম নিয়ে। বাবা শ্রীমতী ইরাবতী কার্ভের 'যুগান্ত' বইটা পাঠিয়েছিলেন, তা প'ড়েই এই উত্তেজনা। যেন কিছু একটা পেয়েছি। কোনো একটা পথ !

আমি তো ভেবেছিলুম কেবল অভিনয় করব। কিন্তু থিয়েটার আমাকে দিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু করিয়ে নিল। নাটকটা লেখা হ'লো। 'নাথবতী অনাথবৎ'। এ যেন একটা আশ্চর্য ঘটনা!

একটা কথা ব'লে রাখি এইখানে। থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছিলুম ঠিকই। কিন্তু এইসময়ে গানটা খুব বেশী ক'রে চর্চা করছিলুম। শরীরটা স্বচ্ছন্দ রাখার চেষ্টা করতুম। কেন করতুম জানি না। কোনোদিন আবার থিয়েটার করব এমনও ঠিক ভাবিনি তো প্রথম থেকে! বরং ধ'রেই নিয়েছিলুম আর হবে না কিছু করা, তবু করতুম। বোধ ক'রি সেই তাড়নাটা ছিল অনেক গভীরে, বুঝতে পারিনি। নইলে কেন করতুম?

যখন নাটকটা লিখছি তখন এই বিষয়টাকে স্মরণ ক'রে অনেক ছবি আমার মাথায় আসতে লাগল। টুকরো-টুকরো, ঝাপসা-ঝাপসা। কিন্তু আসত। এরই মধ্যে এইরকম অনেক ছবির ঘোরে যখন ভাষা ও সুরের সঙ্গে প্রায় লড়াই-এ ব্যস্ত তখন হঠাৎ, অনেকেই যাকে 'বোকা বাক্স' ব'লে তাচ্ছিল্য করেন, সেই তারই মধ্যে শ্রীমতী শোভা নাইডু, ও শ্রীমতী পদ্মা সুব্রহ্মনিয়ম— এই দুই বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীর নৃত্য দেখে আমার সামনে যেন কল্পনার দরজা খুলে গেল। কথকতার আঙ্গিক নিয়ে তখন খুব ভাবছি তো!

লেখা হ'লো শেষ পর্যন্ত। কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই, টাকাকড়ি নেই, তবুও মঞ্চস্থ-ও হ'লো এ নাটক। আর কি আশ্চর্য কি আশ্চর্য—একেবারে প্রথম অভিনয় থেকেই দর্শক কত আগ্রহ ক'রে দেখতে এলেন! এখনো দেখেন। এই আটবছর ন'বছর পরেও, প্রায় শ' তিনেক অভিনয় হ'য়ে যাবার পরেও। কি আশ্চর্য! কি কৃতজ্ঞ যে লাগে!

এর পরে আমরা 'দশচক্র' এবং 'রাজা' করেছি। তার একটি বাবার নির্দেশনায়, আর দ্বিতীয়টি বাবার নির্দেশনারই অনুসরণে, বাবার পরামর্শ নিয়ে নিয়ে। 'দশচক্র' ১৯৮৫ সালে হ'য়েছিল। 'রাজা' করেছিলুম ১৯৮৭ সালে। 'দশচক্রে' এবারও মঞ্জু। কিন্তু 'রাজা'য় সুদর্শনা এবারে। সে আর এক অভিজ্ঞতা।

এর পর আবারও নিজে লিখে নেওয়া নাটক— 'কথা অমৃতসমান'।

'নাথবতী অনাথবৎ' ১৯৮৩ সালে করা। 'কথা অমৃতসমান' হ'য়েছে ১৯৯০ সালে। মাঝে ঐ '৮৭-তে সুদর্শনা— 'রাজা'-য়। এইগুলো করতে করতে আমার ক্রমশঃ অনুভবের অনেকগুলো স্তর তৈরী হ'লো। কেন যে অভিনয় ক'রি (এখন যদিও শুধু অভিনয় নয় আর—থিয়েটারের অনেকগুলো কাজই ক'রি।) সেই অনুভবের অনেকগুলো স্তর।
এই প্রসঙ্গে একটা কথা স্বীকার করা ভালো— 'রাজা' আমরা যেমনভাবে

চেয়েছিলুম তেমনভাবে ক'রে উঠতে পারিনি। আমারও নানান কারণে সুদর্শনার চরিত্রের তাল পেতে দেরী হয়েছে। যখন ক্রমশঃ তাল পেতে শুরু করলুম দুর্ভাগ্যবশতঃ তখনই 'রাজা' বন্ধ ক'রে দিতে হ'লো। সে কষ্ট আমার কোনোদিন যাবে না।

অনুভব সম্পর্কে যা বলছিলুম তা হ'লো এই—নিজের উপলব্ধির কথা, অভিজ্ঞতার কথা, সমাজের প্রতি দায় অনুভব করার কথা—এইসব ছাড়িয়ে, এসবের বাইরে একটা কথা আছে —বড় সহজ, বড় আপনার কথা—। সে হ'লো—
এই কাজে একটা গভীর আনন্দ আছে! এই কাজ করতে করতে— অভিনয় করতে করতে আমার সব ইন্দ্রিয় যখন সজাগ হ'য়ে ওঠে, যখন মনটা উজাড় ক'রে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন দর্শকের সঙ্গে সরাসরি একটা সম্পর্ক স্থাপন করবার গভীর আনন্দ। সেখানে সমস্ত বড় কথা ছেড়ে দিয়ে আমার চোখ, নাক, নাকের পাটা, ভুরু, ঠোঁটের কোণ— এই সমস্ত প্রত্যঙ্গের ব্যবহারের একটা খেলা আছে। খেলা আছে একটু নেচে দেওয়ায়, হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানোয়, হঠাৎ গলাটা খাদে নামিয়ে, তারপর আরো খাদে, আরো গভীর খাদে নামতে থাকায় ; হঠাৎ তিন অক্টেভের একেবারে ওপরের সা-টাকে ছুঁয়ে দেওয়ায় ; রসিকতায়, ব্যঙ্গে—কত কী তে ; গলাটাতে হঠাৎই একটা ভাঙা আওয়াজ বার ক'রে আবার সহজ সুরে ফিরে আসি। — আর তখন কেমন একটা অদ্ভুত অনুভব হয় সারা শরীরে, মনে। তখন কোনো কোনোদিন মনে হয়—এই যে আমার সব উজাড় ক'রে যে খেলা খেললুম, দর্শকের সঙ্গে এই যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করা হ'লো আমার এই খেলার সূত্রে— তাতে কোথায় যেন আমি অনেক মানুষের মনের সঙ্গে এক হ'য়ে গেলুম। কিছুক্ষণের জন্য আমার ভাবনা তাদের আর তাদের ভাবনা আমার হ'য়ে উঠল,— রসিকতায়, হাসিতে, ব্যঙ্গে, কান্নায়, আবেগে, অনুভবে—আর তখন— প্রত্যেকদিন অভিনয়ের শেষেই তা হয় না, কোনো কোনোদিনই হয়, আর সেই অ-সাধারণ দিনগুলোতে আমি কি যেন একটা পেয়ে যাই, অমূল্য কিছু, অমূল্য—কোনো কিছু দিয়েই যার মূল্য গোনা যায় না সেই অমূল্য কিছু। এ পাওয়া একেবারেই ক্ষণিকের পাওয়া, এ পাওয়া স্থায়ী হয় না, কিন্তু অনেক স্তরের। এই পাওয়াটা বোধহয় আর কিছুতে পাওয়া যায় না এমন ক'রে। তাই জন্যেই হয়তো, হ্যাঁ হয়তো তাই জন্যেই সমস্ত অসুবিধা, প্রতিকূলতা, আর্থিক অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তার অভাব— এ সব সত্ত্বেও এই কাজটাই ক'রি। আমারই জন্যে! আমার নিজেরই জন্যে!

একুশ/ বাইশ বছর ধ'রে কাজ ক'রে ক'রে অনুভবের বিবর্তনটা এমনি ক'রেই হ'য়েছে।

হয়তো আবারও হবে। হয়তো গাঢ়তর কোনো অনুভব ধন্য করবে আমাকে!

কিংবা হয়তো তা হবে না। হয়তো আবারও সব ছেড়ে দিতে হবে !

জানি না তো ! ভবিষ্যতের কথা আর কে বলতে পারে !

[এই বইটার জন্য সব পুরোণো লেখাপত্তর ঘাঁটতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ের দু'তিনটি লেখা আবিষ্কৃত হ'লো যা এখন আর ছাপাবার উপযোগী নয়। কিন্তু এই তিনটি লেখাতেই, বিভিন্ন সময়ে লেখা, এই কাজটা কেন করা তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আভাস রয়েছে। মনে হ'লো এই বিষয়টা জরুরী। তাই নতুন ক'রে এই রচনাটি লেখবার প্রয়াস— এই কাজটা সম্পর্কে আমার অনুভবের বিবর্ত্তন নিয়ে।
সম্প্রতি বাংলাদেশের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যতত্ত্ব বিভাগ তাঁদের মুখপত্রে ছাপাবার জন্য এ লেখাটি সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন।]

কথকতার ঐতিহ্য ও নাট্যশিল্পের উজ্জীবনের ভাবনা : একটি

শ্রীশিবনারায়ণ রায়
শ্রদ্ধাষ্পদেষু,

আপনি থিয়েটার নিয়ে একটা ভালো লেখা লিখতে বলেছিলেন অনেকদিন আগেই, লোকনাট্য নিয়ে আমার গবেষণামূলক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে। কথকতার বিভিন্ন ধারা দেখার অভিজ্ঞতা এবং তা থেকে বর্তমান থিয়েটারের কাজে আমার ভাবনার প্রকাশ—এইটিই বোধহয় মূল কথা। কথাটা ভারী, আর আমার ক্ষমতা কম। বুঝতে পারছিলাম না বলার কথাটা ঠিকমত ব'লে উঠতে পারব কি না। আজ ভাবছি চেষ্টা ক'রি— কারণ আপনার কথা অনুযায়ী—জলে না নামলে সাঁতার শেখা যায় না।

যে-কথাটা বলব ভেবেছি তা বলতে গেলে বোধহয় আমাদের আজকের থিয়েটারের প্রেক্ষাপটটা একটু ভেবে নিতে হবে। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস যা পাওয়া যায় তাতে সাধারণভাবে তো এইরকম মনে করা হ'য়ে থাকে যে এক বিদেশী ভদ্রলোকের শুভপ্রচেষ্টায় এই কলকাতায় প্রথম বাংলা নাটকাভিনয় হয় অষ্টাদশশতাব্দীর শেষ দশকে! কিন্তু এই প্রচেষ্টায় সহযোগী ছিলেন একজন বাঙালী। আর এই সম্পর্কে যেটুকু খোঁজখবর পাওয়া যায় তাতে আশ্চর্য হ'তে হয় যে ঐ বাঙালী ভদ্রলোকটির মাথায় এত পরিকল্পনা খেলা করল কি ক'রে? তাইতেই আন্দাজ হয় যে এ দেশে এই জাতীয় মাধ্যমে নিজেকে মেলে ধরবার প্রয়াস ছিলই, পুরোটাই বিদেশ থেকে আমদানী করা নয়। এর পর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যখন নাটক লেখা এবং নাটকাভিনয়ের চল বাড়ল তখন যেসব নাটক বিখ্যাত হ'য়েছিল তার মধ্যে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' আছে, 'নীলদর্পণ' আছে, 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ' আছে— যেগুলো তৎকালীন বাঙালীসমাজের সমস্যা নিয়ে লেখা। বুঝতে পারি নাটককারেরা কি পরিমাণ দায় বোধ করতেন সমাজ সম্পর্কে। এই এক একটা নাটকের নামেই আমাদের মনে প'ড়ে যায় না কি অনেক ইতিহাস? অনেক গল্প? মনে প'ড়ে গর্ববোধ হয় না কি যে প্রথম টিকিট বিক্রী ক'রে নাটকাভিনয় শুরু হয় যে নাটক দিয়ে সে নাটক 'নীলদর্পণ'?

আবার ক্রমে এমন মহৎ নাটককারও আমরা পেয়েছি যাঁর নাটকে পরিস্ফুট হয় মানবিক সমস্যা। যিনি অক্লেশে বলতে পারেন "মানুষের সব গুরুতর সমস্যাই চিরকালের।" আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছিলাম নাটককার হিসেবে। তাঁর চিন্তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা দিয়ে তিনি এমনসব নাটকের জন্ম দিয়েছেন আজকের পরিপ্রেক্ষিতেও যেগুলো প্রকৃত অর্থে অত্যন্ত আধুনিক। রবীন্দ্রনাথ নিবিড়ভাবে চেষ্টা করেছিলেন নাট্যশিল্পে এক ভারতীয় অনুভবের সঞ্চার ঘটাতে। কেবল আঙ্গিকের ক্ষেত্রেই নয়—বোধ এবং মননের ক্ষেত্রেও। 'রক্তকরবী', 'রাজা', 'ডাকঘর' এগুলো পড়লেই মনে হয় যে নাটকগুলো ভিন্ন জাতের! রবীন্দ্রনাথের থিয়েটার ছিল সাধারণ থিয়েটার থেকে ভিন্ন অন্য এক স্রোত, অন্য থিয়েটার।

এইরকম অন্য থিয়েটার আবারও সাধারণ থিয়েটারের পাশাপাশি চলেছে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে। 'নবান্ন' তখন তুলনাবিহীন নজির সৃষ্টি করেছিল। তারপর সেই ধারার প্রচেষ্টা বন্ধ হ'য়ে যায়নি। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে অনেক সফল প্রচেষ্টা হ'য়েছিল যা ব্যাপকভাবে সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম। সেইমত অনেক দর্শক তৈরী হ'য়ে উঠেছিলেন যাঁরা এই নাট্যকর্মের মধ্যে মননশীলতা খুঁজে পেতেন। এই শিল্প একাধারে সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের এবং আগত দর্শকদের চিন্তার মান উন্নত করত। আর এই কাজের অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'য়ে চলেছিল আমার সামনে— কিন্তু তখন আমার বোধের বাইরে। যখন আমি কোলে, যখন আমি সবে দাঁড়াতে শিখছি, তারপর স্কুলে যাচ্ছি—ইত্যাদি ইত্যাদি। আজ সেই আবছা অনুভবগুলোও কিন্তু অর্থ বহন করে আমার কাছে; কার আশীর্বাদে জানি না তাদের সবটাই বৃথা হ'য়ে যায়নি।

এখন আবার বেশ কিছুদিন ধ'রে দেখা যাচ্ছে অবস্থাটা একটা জায়গায় আটকে গেছে। আর, কোনো জায়গায় একভাবে আটকে থাকলে সেটা তো ক্রমশঃ নীচের দিকেই টেনে নিয়ে যায়! তাই এখন একটা শিকড় খুঁজে পাবার চেষ্টা করা খুব প্রয়োজন।

আমরা জানি আমাদের দেশের যে গ্রামীণ সভ্যতা ও তার মধ্যে যে সংস্কৃতি লুকিয়ে আছে তা তার আপন জোরেই অত্যন্ত অভিজাত। ভারতবর্ষের অনেক জায়গাতেই এই ধরনের মূল্যবান মণিমুক্তা ছড়িয়ে আছে। এই কথা মনে ক'রে এই সমস্ত ক্ষেত্রে শিকড় খোঁজার ইচ্ছে হ'য়েছিল। মনে হ'য়েছিল থিয়েটারের কাজ করতে গেলে হয়তো এরই মধ্যে আমি আমার নিজের কাঠামো তৈরী করবার রসদ খুঁজে পাব। আমি যে আবহাওয়ায় বড় হ'য়েছি তা তো পুরোপুরি নাট্যের আবহাওয়া—আর সেই আবহাওয়ায় সব সময়ই চলত এক নিজস্বতার অন্বেষণ— তা থিয়েটারের ক্ষেত্রেও বটে, জীবনধারণের ক্ষেত্রেও বটে। জানি না সেইটাই আমার এই অনুসন্ধিৎসার উৎস কি না।

ভাবনাগুলো তো অন্তরের মধ্যে বাসা বাঁধে, বাঁধেই। কোনো কারণে নাড়া পড়লে সেই নানারকমের ভাবনা চোখের সামনে খেলা ক'রে ওঠে। তারপর চিন্তার একটা সুস্পষ্ট ধারা তৈরী হয়, ক্রমে ক্রমে। সেইরকম ভাবে আমার ভাবনাগুলোও একটা স্পষ্ট রূপ নিল। ভাবনাগুলো এইরকম—

আমরা সংস্কৃতির যে-ধারাগুলো দেখতে অভ্যস্ত তার মধ্যে উচ্চাঙ্গসঙ্গীত আছে, ওড়িশি, ভরতনাট্যম্, কথক ইত্যাদি ধারার নাচ আছে, অনেক ধরণের বাদ্যযন্ত্র আছে। এগুলোর সুর, ভঙ্গী, ছন্দ দর্শকদের ওপরে মোহ বিস্তার করে। কথার প্রয়োজন এখানে তত তীব্র নয়। কথা না থাকলেও অনেক সময়েই কোনো উচ্চপর্য্যায়ের নৃত্যানুষ্ঠান দেখতে দেখতে আমরা বুঝতে পারি এই অনুষ্ঠান কী কাহিনী বর্ণনা করছে। আবার কবিতা আবৃত্তিও আমাদের অত্যন্ত প্রিয়—মানুষ ভালোবাসেন আবৃত্তি শুনতে— এই আবৃত্তি কিন্তু সম্পূর্ণই কথার শব্দনির্ভর।

এই সমস্ত শিল্পের আলাদা আলাদা অনুভবগুলো অনেকসময়েই মিলিত হ'তে দেখি সার্থক নাট্যসৃষ্টিতে। মঞ্চের পাত্রপাত্রী উঠে দাঁড়িয়ে চ'লে ব'সে এক চলমান ছবি তৈরী করেন প্রতি মুহূর্তে। সেটাও ঐ শিল্পসৃষ্টির একটা অঙ্গ।

উচ্চপর্য্যায়ের নাট্যসৃষ্টিতে আমরা দেখেছি এই সমস্ত অনুভবগুলো অতি সূক্ষ্মভাবে আমাদের চেতনাকে নাড়া দেয়। এই নাড়া খাওয়ার জন্যেই তো থিয়েটারকে ভালোবাসা। 'রক্তকরবী' নাটকের শম্ভুমিত্রকৃত প্রযোজনায় পর্দা উঠলেই দেখা যেত মঞ্চের বাঁদিকে, যাকে বলে এ্যাকটরস্ লেফট্-এ, শ্বেতপাথরের চাতালের ওপরে ধানী রঙের কাপড় পরা একটি মেয়ে ব'সে বোধহয় কুঁদফুলেরই মালা গাঁথছে— আর দূরে লোহালক্কড় দিয়ে এক অদ্ভুত সঙ্গীতের সৃষ্টি হ'ত সেই সময়ে—সেই আওয়াজ ছাপিয়ে কিশোরকণ্ঠ ডেকে উঠত 'নন্দিনী-ই-ই !' আওয়াজে রঙে সঙ্গীতে সে এক কাব্যময় শুরু। পুরো মঞ্চটায় নানান স্তরের ব্যবহারে, রঙের ব্যবহারে, পাত্রপাত্রীর চলা বসায় সবসময়েই যেন ছবি তৈরী হ'চ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে, নতুন ছবি তৈরী হ'য়ে উঠছে। তারই সঙ্গে ধ্বনির ব্যবহার। ধ্বনি মানে বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের বিভিন্ন আওয়াজই কানে অর্থময় শব্দের কাঠামো তৈরী ক'রে এক ব্যঞ্জনা এনে দেয়। এক্ষুনি 'রক্তকরবী'-র উদাহরণ মনে পড়ল। কিন্তু এরকম আরও উদাহরণ দেওয়া যায়। পাঠকদের মধ্যে যাঁরা নাট্যদর্শক তাঁদের আপনিই মনে পড়বে।

'৮২ সালে যখন নিজে নাটক করব ব'লে নতুনভাবে ভাবতে শুরু করলাম, কী করলে ভালো হয় ভাবতে গিয়ে মনে হ'য়েছিল আমাদের দেশের পুরোণো গ্রামীণ নাট্যধারা কথকতার কথা। বীজটা বপন ক'রে দিয়েছিলেন বাবা। বাবাই কথাপ্রসঙ্গে একদিন কথকতার কথা বলছিলেন—কথকতার ধরণ ক'রে ক'রে দেখাচ্ছিলেন। এই আলোচনা থেকেই মনে হ'ল আধুনিক থিয়েটারে এই নাট্যধারার ব্যবহার অত্যন্ত ফলপ্রসূ হ'তে পারে। সেই থেকেই শুরু হ'ল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। মনে হ'লো এই বর্ণনামূলক ভঙ্গীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা প্রকাশ করা যায়। আরও মনে হ'লো এতে গান এবং নাচের খুব বড় ভূমিকা

থাকবে। এই ক্ষেত্রে তা অপ্রাসঙ্গিক না হ'য়ে দর্শকের কাছে পৌঁছনোর সুবিধে ক'রে দেবে। এই থেকে আমার একটা কথা বার বার মনে হয়— বোধহয় কথাটা সম্পূর্ণ ভুল নয়— মনে হয় আমাদের ভেতরেই বোধহয় আমাদের শিকড়ের কাজ কোথাও চলে। নইলে এই শহরে-মানুষ-হওয়া আমার কল্পনায়, যে কখনো এসব দেখেনি, পুরো ব্যাপারটা এত অর্থবহ, এত দামী হ'য়ে উঠল কেন?— এই কল্পনা থেকেই 'নাথবতী অনাথবৎ' তৈরী হ'লো—অর্থাৎ লেখা হ'লো এবং মঞ্চস্থ হ'লো। মঞ্চস্থ হ'লো '৮৩-র মাঝামাঝি।

এরপর ফোর্ডফাউন্ডেশন-এর একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী আমি কিছু বর্ণনাত্মক লোকনাট্যধারা দেখবার জন্যে ভারতবর্ষের কয়েকটি অঞ্চলে যাবার সুযোগ পেলাম—'৮৫ সালে
প্রথমে বিহারে গেলাম। তেমন কিছু পাওয়া গেল না।
মহারাষ্ট্রে গিয়ে সেই প্রথম এইরকম ধারার অনেক ধরণ দেখতে পেলাম। বোম্বাই থেকে বহু দূরে পরবনী, একটি জেলাশহর। সেখানে প্রথমেই আটানব্বুই বছরের বৃদ্ধ রাজারাম ভউ কদমের সঙ্গে আলাপ হ'লো। তিনি 'গোন্দেড়' শিল্পী। 'গোন্দেড়' একটি বহু পুরোনো লোকনাট্য—এবং যাকে রিচুয়্যাল ড্রামা বলা যায় সেইরকম। দেবী অম্বার পূজার পর এই নাট্য অভিনীত হয়। এরও আবার দু'রকম ভাগ আছে। অত খুঁটিনাটির মধ্যে না গিয়ে বলি এই লোকনাট্য আমি যা খুঁজছিলাম তাই-ই— কথানির্ভর। এর মধ্যে নাচ আছে, গান আছে, কিন্তু প্রধান অবলম্বন 'কথা।'
রাজারামজীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে বললুম,
—'বাবা, আমি শিখতে এসেছি।'
সঙ্গে সঙ্গে ভাষা প্রেক্ষাপট সব কিছুর ভেদ ঘুচে গিয়ে পিতা-কন্যার সম্বন্ধ স্থাপিত হ'য়ে গেল, নিমেষে। 'বাবা' (ওঁকে ওখানে সকলে 'বাবা' বলেই ডাকে) আদেশ দিলেন 'বিটিয়া যা দেখবে সব আমার উঠোনে। কোথাও ঘোরাবে না রোদ্দুরে। গ্রাম থেকে শিল্পীদের আমার বাড়ীতে ডাকো। এখানে তা'রা করুক। বিটিয়া কক্ষনো হোটেলে খাবে না, খাবে আমার বাড়ীতে।'
বাবাকে অমান্য করার সাধ্য কারুর নেই। অতএব সেইরকমই হ'লো। রাজারামজীর বাড়ীর উঠোনে আমি অনেকরকমের নাট্যধারা দেখলাম দু'দিন ধ'রে। তার কোনোটা হয়তো শুধুই গান-নাচনির্ভর। বৃদ্ধ তখন নাক কুঁচকে গোপনে আমাকে বলতেন,
'বিটি এইরকম গান তো হ'তেই পাবে। আসল মজা হ'লো 'কথা'—'কথা'।'
এই সময়ে 'কথা' শব্দটা এত দরদ দিয়ে উচ্চারণ করতেন।
আমাকে বোঝাবার জন্য ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলতেন। ওখানকার খুব কম শিল্পীই হিন্দী জানতেন। আমার সঙ্গে বম্বের এক ভদ্রলোক ছিলেন,— তিনি মাঝে মাঝে হিন্দীতে অনুবাদ ক'রে বা আমার কথা মারাঠীভাষায় ব'লে দোভাষীর কাজ করতেন। এত বাধা সত্ত্বেও পারস্পরিক সম্মান বা ভালোবাসার সম্পর্ক গড়তে অসুবিধা হয়নি। তাইজন্যেই বাসস্ট্যান্ড ভ'রে লোকশিল্পীরা দাঁড়িয়েছিলেন, সারারাত ধ'রে বাসে ক'রে যেদিন বম্বেতে ফিরব সেইদিন,

পরবনীর বাসস্ট্যান্ডে আমাকে বিদায় জানাতে।

আমি পৌঁছুবার পরের দিন রাত ১০টা থেকে রাজারামজী আমাকে দু'টি পালা ক'রে দেখালেন, দু ঘন্টা ধ'রে— নেচে, গেয়ে, অভিনয় ক'রে। এঁর সঙ্গে একটা জুড়ির দল থাকে। তারা ওঁর সঙ্গে গান করে, বাজনা বাজায়, কোনো কোনো সময়ে প্রয়োজন হ'লে এগিয়ে এসে কোনো একটি চরিত্রে অভিনয় ক'রে আবার পিছিয়ে পূর্ব-ভূমিকায় চ'লে যায়—জুড়ির দলে। চার পাঁচরকমের যন্ত্র বাজে সঙ্গে। সে সমস্ত যন্ত্রগুলো বাজাতে জানতে হয় সব গোন্দেড় শিল্পীকে, ছোট্টবেলা থেকে তাদের শিখতে হয় এই শিল্প। রাজারামজী এখন শেখাচ্ছেন তাঁর নাতির ছেলেকে। পুরো পরিবারের আশা এই নামদেও একদিন রাজারামজীর মতই গুণীর সম্মান অর্জন করবে। রাজারামজীর ছেলে, নাতি, ভাইপোর ছেলে,— সবাই ওঁর সঙ্গে জুড়ির দলে থাকে কিন্তু কেউই ওঁর পর্যায়ের শিল্পী নয়।

এই জুড়ির ব্যাপারটা ভাবলে আমার বেশ মজা লাগে—আমি অন্যত্রও দেখেছি কথাকারের সঙ্গে ছোটো হোক বড়ো হোক একটা জুড়ির দল থাকেই। তাই ভাবলে আমার ভীষণ আশ্চর্য লাগে যে গোড়াতেই আমার সঙ্গে একটা জুড়ির দল থাকবে এইরকম একটা কল্পনা হ'য়েছিল আমার—এই কথাটা একেবারে অজানা থাকা সত্ত্বেও। কী ক'রে ? কেন ঐ জুড়ির দলের কল্পনাটা আমি করেছিলাম ? জানি না। এইসব কারণেই মনে হ'চ্ছিল শিকড় কোথাও কাজ করে !

যাই হোক, রাজারামজীর কথায় ফিরি। পালা অভিনয়ের সময়ে তাঁর পরণে থাকে ষাট-মিটার কাপড়ে তৈরী এক পোষাক—গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা পুরো-হাতা একটা আলখাল্লার মতন জামা, কোরা কাপড়ের। গলায় অনেকগুলো কড়ির মালা, মাথায় লাল পাগড়ি, কপালে তিলক, একটা ফাগরঙা শাল গায়ে, পায়ে ঘুঙুর। নাচ, গান, কথা এবং অভিনয়ে এই বৃদ্ধ এই বয়সেও অত্যন্ত সজীব—-আমাদের কাছে এক বিস্ময়। কিন্তু তাঁর বলা কাহিনী শুনলে আমাদের মন ঠোক্কর খায়। কীরকম বলব ?
তাঁর প্রথম পালা 'রাধাবিলাস'। তার বক্তব্য হ'লো—কৃষ্ণের শৈশবেই যুবতী রাধা তার প্রেমে পড়েছিল। তাকে কোলে নিয়ে রাধা আদর করত। (এই সময়ে রাজারামজী ফাগরঙা শালটি দিয়ে ঘোমটা দেন আর বৃদ্ধমুখ এবং বিরাট একজোড়া সাদা গোঁফ নিয়েও রাধা হ'য়ে যান অক্লেশে, আর তার সঙ্গে আলখাল্লার কুঁচির খানিকটা তুলে অদ্ভুত কায়দায় পাকিয়ে শালের অপর অংশ দিয়ে ঢেকে সেটাকে শিশু কৃষ্ণ তৈরী করেন—সেটা কোলে দুলিয়ে নাচেন।) তারপর কৃষ্ণ যুবক হ'লো (রাজারামজী বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিলেন) তখন রাধা প্রায় জোর ক'রে নিয়ে গেল তাকে নিজের ঘরে এবং শিকল তুলে দিল। ঠিক সেই সময়ে রাধার স্বামী এসে পড়ল। কৃষ্ণ তো আগে গোরাই ছিল—রাধার এই পাপে কৃষ্ণ লজ্জায় কালো হ'য়ে গেল। —কাহিনীটা শুনে

কিরকম খটকা লাগে না ?
ঠিক তেমনি তাঁর দ্বিতীয় পালা 'জাম্বুলাখ্যান'। এটি দ্রৌপদী সম্পর্কিত কাহিনী। তাতে বলা হয় দ্রৌপদী কর্ণকে ভালোবেসেছিল পঞ্চস্বামী থাকা সত্ত্বেও— এতই অসতী সে।
অথচ এই কাহিনী মহাভারতে নেই। এই লোককাহিনীর সত্যতার প্রতিবাদ করেছেন মহারাষ্ট্রেরই বিদুষী ইরাবতী কার্ভে যথেষ্ট যুক্তি দিয়ে।
এইসব খটকা সত্ত্বেও রাজারামজীর নাচ গান অভিনয় দেখে ঘন্টার পর ঘন্টা হারিয়ে গেলেও আফশোষ হবে না।

ওখানে 'বাসুদেও' 'বরাট' 'ডাকা' প্রভৃতি আরো অনেক ধারা দেখেছিলাম। আর দেখেছিলাম 'বৈঠকী চিলাওনী'—এক বিশেষ পল্লীতে। সে কথা অন্যত্র।

এরপর আসি মধ্যপ্রদেশের কথায়। প্রথমে ভোপালে গেলাম। সেখানে কলাপরিষদে ভিডিও টেপে ধরা অনেক নাট্যধারা দেখলাম। সেখান থেকে উজ্জয়িনী। সেখানে 'মাচ্ছ্' ব'লে একটা চার-পাঁচশো বছরের প্রাচীন ধারা দেখলাম। তারপর গেলাম রায়পুর হ'য়ে তিজনবাই-এর গ্রামে, গনেয়ারীতে। তিজনবাই 'পান্ডোয়ানি' করেন, অর্থাৎ পাণ্ডবদের গল্প বলেন— কথায়, নাচে, গানে। সঙ্গে সেই জুড়ির দল। চৈত্রশেষের এক দুপুরে পৌঁছলাম তাঁর বাড়ী। সেই মাটির বাড়ীর মাটির উঠোনে তিজনবাই তাঁর পালা দেখালেন কিছুক্ষণ। আমি দ্রৌপদীকে নিয়ে পালা করেছি শুনে তিনি পাশা খেলার অংশ ক'রে দেখালেন। আর তাঁর হাতের তম্বুরাকে কখনো বাজিয়ে, কখনো গদা ক'রে, কখনো ধনুক ক'রে—নানান ভাবে ব্যবহার ক'রে পরতের পর পরতে ছবি তৈরী করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর পালায় তিনি বললেন দুর্যোধনের দ্রৌপদীকে অপমান করবার বাড়াবাড়িতে ধৃতরাষ্ট্র নাকি ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠেছিলেন, তাকে ত্যাজ্য করতে চেয়েছিলেন। যা নাকি মহাভারতে নেই। তিজনবাইকে আমি পরেও অনেকবার অভিনয় করতে দেখেছি। আর দেখেছি ঝাড়ুরামকে আর পুনারামকে। এঁরাও পাণ্ডোয়ানির শিল্পী। এঁরা কিন্তু কখনো উঠে দাঁড়ান না, নাচেন না—বড়জোর হাঁটুতে ভর দিয়ে অর্ধোত্থিত হন। আর সামান্য ভঙ্গী, সামান্য অভিব্যক্তি দিয়ে অসামান্য গভীর ছবি তৈরী করেন। যেমন পুনারাম দেখান—অভিমন্যুকে চক্রব্যূহ ভেদ করার জন্য বিদায় দিচ্ছেন সুভদ্রা ও উত্তরা।
দু'জনে আরতি করছেন। সুভদ্রা হ'য়ে পুনারাম একবারও সামনের কল্পিত অভিমন্যুর মুখ থেকে চোখ সরান না। চোখ দুটো যেন যতটা পারে পুত্রকে দেখে নিচ্ছে। আর উত্তরা হ'য়ে তিনি চোখ তুলে তাকাতে পারেন না অভিমন্যুর দিকে, আর অন্যদিকে তাকিয়ে আরতি করতে গিয়ে প্রদীপ প'ড়ে নিভে যায়। আমরাও অমঙ্গল আশঙ্কায় কেঁপে উঠি।

মধ্যপ্রদেশে আরো অনেকগুলি ধারা দেখেছি। সেসবের বর্ণনা থাক। কেবল রামকিস্‌সার কথাটি না ব'লে পারছি না। দেখেছিলাম বিলাসপুরে। দু'জন শিল্পী রামায়ণের কাহিনী বলেন। এর মধ্যে জওহর বাঘেল প্রধান এবং অসাধারণ শিল্পী, ইনি আবার চমৎকার বাঁশী বাজান। প্রয়োজন পড়লে বাঁশী বাজিয়ে সঙ্গত করেন। বিখ্যাত লোকশিল্পী, গায়িকা সুরজবাই-এর সঙ্গে এঁকে সঙ্গত করতে দেখেছি বাঁশীতে। আবার সুরজবাই জওহরের রামকিস্‌সার জুড়িতে গাইতে বসেন। চনচনে গলা। জওহর বাঘেল এবং এঁর সহকারী লক্ষ্মণ খাণ্ডে পিছনে বেশ বড় সড় জুড়ির দল নিয়ে আসর করেন এবং মাতিয়ে দেন। এই দু'জন শিল্পী যে কীভাবে নিজেদের শরীরকে ব্যবহার করেন সে না দেখলে বিশ্বাস করবার নয়। যা-ইচ্ছে করেন নিজেদের গলা এবং শরীর নিয়ে। কিরকম বলব ? একটা উদাহরণ দিই। কেবট্ট রামকে নদী পার ক'রে দিচ্ছে—এই সময়ে দু'জনে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে বসেন। এঁদের হাতেও তম্বুরা থাকে। তম্বুরাটা তখন দাঁড় হ'য়ে যায়। এঁরা নৌকো বাইবার অভিনয় করেন। আমাদের মনে হয় উঠোনের মাটিটাই বুঝি স'রে স'রে এঁদের অপর প্রান্তে পৌঁছে দিল ! পৌঁছেই উঠে প'ড়ে গান ধরেন এঁরা। দেখবার সময়ে একটু মনোযোগ শিথিল হ'লেই কোনো এক অসাধারণ মুহূর্ত হারিয়ে যাবে এইরকম বোধ হ'তে থাকে। কাহিনী বোনার ঢংটাও ভারী সুন্দর। দু'জনেই কথাকার আবার দু'জনেই দু'টি চরিত্র। যখন যেমন প্রয়োজন তেমনি চরিত্র। যেমন ইচ্ছে।

অন্ধ্রতেও গিয়েছিলাম। ওখানে হরিকথা, বুড়াকথা—এই দুই বর্ণনামূলক নাট্যধারা দেখেছি।

এইরকম কাজ কিরকম যেন নেশা ধরিয়ে দেয়। যতদূরেই এগোই মনে হয় এগোবার রাস্তা আরো অনেক অনেক দূরে গেছে।

এইরকম নানান নাট্যধারা দেখে আমার মনে হ'য়েছে দর্শকের কাছে একজন কথকের সরাসরি উপস্থাপনা খুব তাড়াতাড়ি কাহিনীর ও তার বক্তব্যের সাথে দর্শকের সেতুবন্ধন ক'রে দেয়। এদের মধ্যে যে গান-নাচ সম্পৃক্ত হ'য়ে আছে তা আমাদের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যবহার করলে অনেক গভীরতা এনে দিতে পারে যা দিয়ে মানুষের অত্যন্ত গভীর বোধকে নাড়া দেওয়া সম্ভব। আর নৃত্য বা ভঙ্গী—তারও এমন একটা ছন্দ, এমন একটা আলাদা ছন্দ আছে যা কেবল চোখের ভালোলাগা ছাড়াও মানুষকে আরো কিছু দেয়।
আমি বলতে চাচ্ছি—বিষয়ের মধ্যে নয় হয়তো, কিন্তু এইসব দেশজ লোকনাট্যের যে কাঠামো তা তার আপন জোরে অভিজাত—ঐ ফর্মগুলোর মধ্যে একটা আভিজাত্যের এবং বুদ্ধির প্রকাশ রয়েছে। আর সেইজন্যেই তা আমাদের আধুনিক অনেক বলবার কথা সহজে প্রকাশ করতে সক্ষম। এই

ধারায় যেমন, যদি আমি কোনো নারীর রূপবর্ণনার সময়ে মুখে শুধু বলি—"সুকেশিনী"-আর নাচের মুদ্রায় সেই কেশের বর্ণনা করি—তার দৈর্ঘ্য তার ঘনত্ব—তাতে অভিনয়ে এমন একটা মাত্রা পায়, দর্শকের কল্পনাকে এমন এক জায়গায় পৌঁছিয়ে দেয় যা হয়তো অন্য পদ্ধতিতে অত সহজে হ'তো না। তার ওপরে আছে 'কথা'—বর্ণনা এবং সংলাপ। এখানে কিছুটা বলা আর অনেকটা দর্শকের কল্পনার ওপরে ছেড়ে দেওয়া। তখন একটা ফাঁকা মঞ্চ এক নিমেষে হ'য়ে উঠতে পারে ঘন জঙ্গল, পরমুহূর্তে সেখানে তৈরী হ'তে পারে সুসজ্জিত প্রাসাদ। এক রূপবতী তরুণী হ'য়ে উঠতেও অসুবিধা নেই, অসুবিধা নেই হ'য়ে উঠতে এক ভয়ঙ্কর যোদ্ধা। কিন্তু এসব ছাড়িয়ে, যে-কথাটা বলছিলাম সেটা হ'লো এইসব দেশজ ধারা মাথায় রেখে এমন কিছু পাণ্ডুলিপি রচনা করতে পারি আমরা যা সমাজের অনেক গূঢ়, অনেক গভীর কথা প্রকাশ ক'রে দেবে অতি সহজে। এই সব নাট্যধারাগুলো এখনো যেসব কথা বলে সেই বলার কথাটির সঙ্গে আমাদের এই একবিংশশতাব্দীতে পা-দিতে যাওয়া সমাজের কথার সঙ্গে বিশেষ যোগ নেই। কিন্তু আমাদের এই আধুনিক সমাজের যা সমস্যা, যা জটিলতা সেসবই এর ফর্মের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব।

একটা কথা মনে রাখা বোধহয় প্রয়োজন— যখন আমরা লোকনাট্য নিয়ে মাতামাতি করি তখন একথা খেয়াল করি না যে আমরা যেসব জিনিস এখন আর সংগত মনে করি না, এমন কি অন্যায় ব'লে মনে করি অনেকসময়েই লোকশিল্পীরা সেইসব ব্যাপারকে যুক্তিসংগত ব'লে প্রকাশ ক'রে থাকেন। অথচ এইসব দেশজ ধারার মধ্যেই এদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির একটি রূপ তো দাঁড়িয়ে আছে! সেইজন্যেই কথাগুলো বলা।

আমরা, নাট্যশিল্পের কর্মীরা, যারা সমাজের সম্পর্কে দায় বোধ করি— আমরা তাই আমাদের ভারতবর্ষকে জানব, তার সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করব, আর তাকে অবলম্বন ক'রেই আমরা আমাদের জীবনের জটিলতাকে প্রকাশ করতে দায়বোধ করব, পুরোনো সংস্কারগুলোকে মুছে, তার সঙ্কীর্ণতাগুলোকে ভেঙে— এইটাই আমার এখনকার ভাবনা। আমি জানি না আপনি যা চেয়েছিলেন আমার দুর্বল কলমে তা প্রকাশ করতে পারলাম কি না। অনেকটা ভাবনার ফসল আমার এইটুকুই।
প্রণাম নেবেন।

জুলাই, ১৯৮৬ শাঁওলী

[১৯৮৫ সালে আমার গবেষণাবিষয়ে জানতে পেরেই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় আমাকে এ বিষয়ে লিখতে অনুরোধ করেছিলেন, এবং তাগাদা করছিলেন ক্রমাগত। তিনি জোর না করলে লেখাটি হয়তো রচিতই হ'তো না। তাঁর কাছে এজন্য কৃতজ্ঞ হ'য়ে আছি। ১৯৮৬ সালে 'জিজ্ঞাসা'য় এটি প্রকাশিত হয়।]

‘নাথবতী—’ ‘—অমৃতসমান’
কিছু প্রশ্ন, কিছু আপত্তি

মহাভারতকে অবলম্বন ক'রে দুটো কাজ করা হ'লো। প্রথমে যখন নাটকটা লিখেছিলাম—‘নাথবতী অনাথবৎ’— তখন দ্রৌপদীর দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ ‘মহাভারত’-এর ঘটনাপরম্পরাকে দেখবার ইচ্ছে হ'য়েছিল। সেই সঙ্গে পৃথিবীতে বাঁচতে বাঁচতে আমি তখন জীবনটাকে যেমন ভাবে দেখছিলাম, তার সঙ্গে সঙ্গে আমার যা বলবার কথা জমে উঠছিল, সেটা মেলানো যাচ্ছে, সেসবটা প্রকাশ করা যাচ্ছে, এমনটা অনুভব ক'রেই ঐ নাটক লেখা হ'লো এবং করা হ'লো। একটা কথা বললে কেউ-বা অবাক হ'তে পারেন কেউ-বা বিরক্ত হ'তে পারেন, কিন্তু সত্যিই, দ্রৌপদীরই অনেক কথা এখনো ঠিকমত বলা হ'য়ে ওঠেনি। দুটো নাটক করার পরেও না। অথচ সেগুলো বলতে পারলে আমার ভালো লাগত। পাঠক অবাক হবেন, কিন্তু সত্যিই আরো কাহিনী আছে।

‘নাথবতী অনাথবৎ’. দেখতে মানুষ ভালোবাসেন। আমি জানি, শুনেছি এমন বেশ কিছু মানুষের কথা যাঁরা ন'বার-দশবার দেখেছেন এ নাটক। মানুষ যে এত আগ্রহ ক'রে এ নাটক দেখেছেন বার বার, হেসেছেন, আপ্লুত হ'য়েছেন, এই জ্ঞান আমাকে এতটাই কৃতজ্ঞ করে যে একান্তে চোখে জল আসে।

এর সঙ্গে সঙ্গেই, এই ন'-দশ বছর ধ'রেই চেনা বা অচেনা বহু দর্শকের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হ'য়েছি আমি। তাঁদের জানবার আগ্রহ, অসীম আগ্রহ।

‘নাথবতী অনাথবৎ’ ক'রে যেতে যেতে, পৃথিবীর সমস্যা যত ঘনীভূত হ'য়েছে, নানান দেশে, নানান দিকে, আমাদেরই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমাধানবিহীন অসম্ভব অবস্থা চলেছে, চলেইছে,— সব মিলিয়ে বর্তমানের যে এক ভয়ঙ্কর রূপ আমরা অনুভব করছি, যে ঘোর দুঃসময়কে অনুভব করছি, সেটা থেকেই আমার ‘কথা অমৃতসমান’ লেখার কথা মনে হয়। এটা প্রাথমিকভাবে দূরদর্শন মাধ্যমের জন্য লেখা হ'য়েছিল, তখন এর মাত্রা ছিল অন্য, ঝোঁক ছিল অন্যত্র। সেটা ১৯৮৫-৮৬ সালের কথা। লেখাটা পড়েইছিল। তারপর বছর পেরিয়েছে, আর সর্বনাশ আরো প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে ক্রমশঃ। সেই সময়ে, এই '৮৯ সালে বিশেষ ভাবে মনে হ'লো এটা মঞ্চে করবার প্রয়োজন আছে। তাই নতুন ক'রে

আবার লিখতে শুরু করা হ'লো। এবং ছ-সাত বার লেখার পর মনে হ'লো মঞ্চে করবার মত একটা রূপ বোধহয় দাঁড়াচ্ছে। অবশ্য মঞ্চস্থ করবার পরও কিছু কিছু রূপবদল ঘটেছে যেমন সব প্রযোজনাতেই হ'য়ে থাকে। '৯০ সালের জানুয়ারীতে এটা মঞ্চস্থ হ'লো—পরপর চার-পাঁচটি অভিনয়।

অনেকে বললেন—'বড্ড বেশি মহাভারত হ'য়ে যাচ্ছে।' আমার দুর্ভাগ্য, সেই সময়ে দূরদর্শনে 'মহাভারত' সিরিয়াল চলছিল। পিটার ব্রুকের 'মহাভারত'ও তখন সবে সবেই নন্দনে দেখানো হয়েছে। তাই কেউ কেউ খুব বিরক্ত হ'য়ে বলেছিলেন—'এত মহাভাবত কেন ?'

কিন্তু কি করব—এইসব কারণে আমার বলবার কথাগুলো জমানো থাক, 'মহাভারতের হাওয়া' কেটে যাক, তারপরে বলব—এমনটা ভাবতে পারিনি।

কেউ বললেন, 'পুনরাবৃত্তি', 'ঐ তো একই রকম', 'একই কথা।'

কেউ লিখলেন, 'মহাভারত কি কেউ জানে না ? এমন ক'রে বলা হ'চ্ছে যেন শিশুদের পাঠ দেওয়া হ'চ্ছে।'

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তবু লোক দেখতে এলেন নাটক, ভিড় ক'রেই এলেন। এবং আবারও নানান প্রশ্ন করতে লাগলেন সেই অসীম আগ্রহ নিয়ে। সত্যবতীর কথা, কুন্তীর কথা, বিদুরের কথা—জানতে চাইলেন অনেক কিছু ; তাঁদের ভাবনার কথাও জানালেন আমাকে। আমি আবার কৃতজ্ঞ হ'লাম। এইরকম অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও দর্শকের এই আগ্রহ, এই জিজ্ঞাসা— আমাকে অনেক জোর দিল। তাঁদের জন্যই তো আমার করা !

এমন সময়ে এই পত্রিকার পক্ষ থেকে একটা লেখা লেখবার অনুরোধ এল। যাঁরা কথা বলতে এলেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পরে মনে হ'লো এঁদেরও ঐরকমই অনেক প্রশ্ন আছে। আর সেরকম লেখাই তাঁরা চান।

তখন মনে হ'লো—আচ্ছা, ধরা যাক সেই কথককে, যে মহাভারতের গল্প নিয়ে পালা ক'রে ক'য়ে বেড়ায়। মনে ক'রে নেওয়া যাক, সেই কথককে এসে ধরেছে একটি মেয়ে। ভেবে নেওয়া যাক, এই মেয়েটি শহুরে মেয়ে, শহরের নিয়মমাফিক শিক্ষায় শিক্ষিতা, শহুরে সমাজে প্রচলিত আলগা মন্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত, আমরা যেমন দেখি চারপাশে—বিচারবোধে কেমন যেন গোলমাল—সেরকম। তা সে বেচারীই বা কি করবে! এরকমই তো দাঁড়িয়েছে অবস্থাটা। কিন্তু এসব সত্ত্বেও মেয়েটি জানতে চায়, অনুভব করতে চায়। অনুভব করতে ভালোবাসে, ভালোবাসে খাটতে, আত্মনির্ভর হ'তে। আর শ্রদ্ধা আছে জীবনের গভীরতা সম্পর্কে।

ধরা যাক তার নাম 'ইন্দিরা'। এই মেয়েটিরই হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেছে কথকের সঙ্গে। কোন পালার আসরে নয়। অন্য কোথাও। হয়তো পথের মাঝখানে। হঠাৎ দেখে ইন্দিরার কেমন চেনা-চেনা লাগে মানুষটিকে। ডেকে বলে—

ইন্দিরা ॥ এই যে শোনো! শোনো! —তুমি কে বল তো? বড্ড চেনা-চেনা লাগছে। —তুমি সেই কথকঠাকরুণ না? আমি তোমাকে দ্রৌপদীর কথা বলতে শুনেছি। আর একটাও কি পালা যেন তুমি কর! সত্যবতী, না কুন্তী—কার গল্প যেন বল? আমি দেখিনি।

কথক ॥ তা নয় মা। যুগের কথা ব'লি, ঐ যুগটার ধ্বংসের কথা ব'লি।

ইন্দিরা ॥ ও! —তা বেশ বল তুমি মহাভারতের কথা! —বল না গো!

কথক ॥ কোথায়? এখানে? এ যে পথ মা!

ইন্দিরা ॥ তা হ'লোই বা! ঐ মাঠটায় চল! —বল না। তুমি তো একলাই বল। তোমার আবার কি লাগবে?

কথক ॥ এ যে পথ! চতুর্দিকে কি হট্টগোল!—একলা বললেই কি মা—সুর আছে, সুরের গহন আছে। তাই না? মনটাকে গুটিয়ে এনে এক জায়গায় সঁপে না দিলে কি রস পাওয়া যায়? হট্টগোলের মধ্যে তো মা রস মেলে না। হট্টগোলের মধ্যে অতি দামী জিনিসও কেমন সস্তা হ'য়ে যায়।

ইন্দিরা ॥ তা বটে! ঠিকই বলেছ তুমি! —কিন্তু তোমার সঙ্গে অনেকগুলো কথা ছিল যে!

কথক ॥ আমার সঙ্গে! আমার সঙ্গে আবার কি কথা মা?

ইন্দিরা ॥ তোমার পালা দেখে অনেক কথা মনে হ'য়েছিল। কিছু জানবার ইচ্ছে ছিল।

কথক ॥ বেশ তো, বল না কি জানবার ইচ্ছে।

ধরা যাক, তারা কোথাও বসল গিয়ে। শোনা যাক, ইন্দিরা কি জানতে চাইল কথকের কাছে।

ইন্দিরা ॥ একটা কথা ব'লি। সবাই বলে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময়ে কৃষ্ণ এসে রক্ষা করেছিল—

কথক ॥ রক্ষা করেছিল? না কি কাপড় সাপ্লাই ক'রে দিয়েছিল? কোনটা বলে?

ইন্দিরা ॥ ঐ, ওর লজ্জা রক্ষা করেছিল। সে সিনেমাতেও দেখেছি। ঐ যে, পিটার ব্রুক ব'লে এক সাহেব যে সিনেমা করেছেন

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, সেখানেও। আবার টি ভি-তেও দেখেছি। আর মহাভারতেও তো দেখেছি লেখা আছে। তোমার পালাতে ওটা একেবারে বাদ দিয়েছ কেন ?

কথক ॥ আসলে জান কি মা, আমি চেষ্টা করেছি মানুষগুলোকে মানুষের মত ক'রে দেখতে। আচ্ছা, কৃষ্ণ আসবে কি ক'রে হঠাৎ ? দ্বারকা কোথায়, আর কোথায় হস্তিনাপুরী। তার কিছুদিন আগে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হবার পর দ্বারকায় ফিরেছে কৃষ্ণ। এবং ফিরেই বিপদে পড়েছে। শিশুপাল বধের দরুণ উত্তেজিত হ'য়ে শিশুপালের বন্ধু সৌভরাজ দ্বারকানগরী আক্রমণ ক'রে তছনছ করছে তখন : তাকে ঠেকাবার জন্য কৃষ্ণকে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়তে হয়। এবং সে ভয়ানক যুদ্ধ। তাকে শায়েস্তা করতে কৃষ্ণের বেশ খানিক সময় লাগে। তারপর যখন সে দ্বারকায় ফিরেছে তখন ঐ দ্যূতসভার সংবাদ শুনেছে ; তক্ষুনি ছুটে এসেছে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু ততদিনে, এক মাসের ব্যবধানে, দু-বার পাশা খেলায় হেরে ওরা বিতাড়িত হ'য়ে বনবাসে চ'লে গেছে। আরে, এটা যে বনপর্বে কৃষ্ণ সবিস্তারে বলে পাণ্ডবদের ! তার মানে ও জানতই না যে বস্ত্রহরণের মত নীচ একটা ঘটনা ঘ'টে গেছে। ও বলছে—'আমি যদি তৎকালে উপস্থিত থাকিতাম, দুরাত্মা দুর্যোধন জীবিত থাকিত না। দ্যূতক্রীড়া কদাচ ঘটিত না।' তবে ?

ইন্দিরা ॥ তাই নাকি ? এটা তো খেয়াল করিনি !

কথক ॥ ঐ তো মা, ঐরকমই হয় কি না ! আমার মনে হয় কি জান, যুগ যুগ ধ'রে তো এ কাহিনী বলা হ'য়েছে—অনেক গপ্পো ঢুকে গেছে, অনেক আজগুবি কাহিনীও ঢুকে গেছে এর মধ্যে। মুখে মুখে ফিরেছে কি না ! পণ্ডিতেরা তো কত সব কথা বলে, কত কথা লেখে, গবেষণা করে এইসব নিয়ে। মহাভারতে কত গপ্পো ঢুকে গেছে ব'লি তোমাকে। একবার জান, বহুদূরে, মহারাষ্ট্রে পরবনী ব'লে একটা জায়গায় এক বুড়োর সঙ্গে আমার দেখা হ'লো। খুব বুড়ো। বললে নাকি আটানব্বই বছর বয়স। তা সে বেশ কয়েক বছর আগের কথা। নাম বললে—রাজারাম ভউ কদম।

ইন্দিরা ॥ ও ! ইনিই তিনি. রাজারাম......, সেই একবার......

কথক ॥ হ্যাঁ তিনিই। পরে যিনি এ শহরে এসেছিলেন, তখন বয়স একশ'র ওপরে। তাই বুঝি নামটা শুনেছ, না ? হ্যাঁ, সেই তিনিই, তাঁর বাড়ির উঠোনে, আমাকে নেচে গেয়ে দ্রৌপদীর কাহিনী শোনালেন।

ইন্দিরা ॥ তুমি যেরকম বল ?

কথক ॥ না, ঠিক সেরকম নয়। তিনি খালি একটা ঘটনা শোনালেন। কাহিনীর নাম বললেন—'জাম্বুলাখ্যান'। তিনি বললেন দ্রৌপদী নাকি কর্ণকে সবচে' বেশি ভালোবেসেছিল। তাই নিয়েই সেই উপাখ্যান। তা ধর, ইনি লোকশিল্পী, মুখে মুখে ফেরা গল্পো নিয়েই ইনি এঁর কাহিনী বলেন। কিন্তু জানো মা, লেখাপড়াজানা লোক, কলেজের মাষ্টার—তারাও আমাকে পালা দেখে দ্রৌপদীর কর্ণকে ভালোবাসার কথা জিজ্ঞাসা করেছেন। যেন এই রকম একটা 'গোপন প্রেম' আবিষ্কার করতে পারলে কাহিনীটা জমে ভালো ! কিন্তু ধর, ঐ মহারাষ্ট্রেরই বিদুষী, ইরাবতী কার্ভে—

ইন্দিরা ॥ তোমার ইরাবতী দিদি ?

কথক ॥ হ্যাঁ, সেই ইরাবতী কার্ভে, যিনি এসব নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেছেন, ভাবনাচিন্তা করেছেন, তিনি তো পষ্ট ব'লে দিয়েছেন যে দ্রৌপদী তার পঞ্চস্বামী ছাড়া কারো দিকে তেমন চোখে তাকায়নি। তার যদি কোন অপরাধ খুঁজে বার করতে পারে কেউ তা হ'লো—সে অর্জুনকে সবচে' বেশি ভালোবেসেছিল, আর তার জন্যেই তো তার সশরীরে স্বর্গলাভ হ'লো না। ঐ নাকি তার পাপ, ভয়ঙ্কর পাপ।

ইন্দিরা ॥ (একটু চুপ ক'রে থেকে বলে) কিন্তু একটা কথা—স্বয়ম্বর সভায় দ্রৌপদী কর্ণকে 'সূতপুত্র' ব'লে প্রত্যাখ্যান করল কেন ? সেটা তো—

কথক ॥ ঠিক হয়নি তার, তাই না ? তাহলে দেখ, কর্ণকে যদি সে ভালোইবাসত তাহলে তো তখনই বরণ করত। প্রত্যাখ্যান করতে গেল কেন ? তাহলে ঐ উপাখ্যানের যুক্তিটা একটু কেমন-কেমন ঠেকে, তাই না ?

ইন্দিরা ॥ হ্যাঁ, কিন্তু আমি বলতে চাইছি—

কথক ॥ বলছি, সেটাও বলছি। দেখ মা, আমি তো বেশি জানি না। আমার যেটুকু বোধবুদ্ধি সেইমতই বলছি। একটু ভেবে দেখ দিকি তুমিই। সেটা সেই যুগ, যেখানে বর্ণবিভাগটা ঐভাবে মানা হ'তো। আর সবচে' বড় কথাটা হ'লো—সেটা ছিল দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা। 'স্বয়ম্বর'—কেমন ? তার যদি কোন পুরুষকে বরণ করবার উপযুক্ত ব'লে মনে না হয়—তার বলবার অধিকার নেই, যে একে আমি বিয়ে করব না ? অন্ততঃ এইটুকু অধিকার সেই সমাজ তাকে দিয়েছিল—এখন তোমরা দাও না। সত্যি বল দিকি—সেটা কি অন্যায়, না অস্বাভাবিক ?

ইন্দিরা ॥ ঠিক। 'স্বয়ম্বর' বটে। তবে এটাও তো ঘোষণা করা

হ'য়েছিল যে ধনুক তোলা এবং তীর ছোঁড়ায় যে উত্তীর্ণ হবে তাকেই দ্রৌপদী বরণ করবে।

কথক ॥ হ'য়েছিল বটে। তবে আমার মনে হয়, ক্ষত্রিয় হিসেবে প্রকৃত বীরের হাতে কন্যাদান করতেই এটা ঘোষণা করা হয়েছিল। তাই ব'লে দ্রৌপদীর মতামত থাকবে না এটা স্থির করা হয়নি। তাহলে বোধহয় ব্যাসদেব বোকার মত ওটাকে 'স্বয়ম্বর' ব'লে বর্ণনা করতেন না। আবার ব'লি, যদি অভিভাবকেরা ঠিক ক'রে থাকেন ঐ পরীক্ষা—তবে তা 'স্বয়ম্বর'-কে নস্যাৎ করবার জন্য নয় বোধহয়, অর্জুনকে নিশ্চিত ক'রে পাবার জন্য।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ ? যখন ঘোষণা করা হ'চ্ছে তখন বলা হ'চ্ছে 'উচ্চকুলশীলসম্পন্ন যে ব্যক্তি এই বিশাল ধনুতে....' ইত্যাদি।

ক্ষত্রিয়রা তাদের চেয়ে উচ্চবর্ণের মানুষ—দেবতা বা ব্রাহ্মণকে স্বীকার ক'রে নিত। কিন্তু কোনো বৈশ্য বা শূদ্র বোধহয় কাজকর্মে যুক্ত হ'তে পারত না। আমার তো বাপু প'ড়ে তাই মনে হ'য়েছে। কারণ, ধর, এক কর্ণ ছাড়া অমন কাউকেই কোন দাবী এইভাবে করতে দেখেছি ব'লে মনে তো পড়ছে না।

আর একজন আমাকে একটা কথা বলেছিলেন বটে, বলেছিলেন—'ব্যাসদেবকে যে স্বীকৃতি দেওয়া হ'য়েছিল সেটা নিয়ে তো কোন সমস্যা হয়নি।'

দেখ, কথায় কথায় কত প্রশ্ন, কত মন্তব্যই মনে প'ড়ে যায়।

ইন্দিরা ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি বল না, সেটা যদি তখন দেওয়া হ'য়ে থাকে তবে কর্ণের বেলাতে কেন—

কথক ॥ জানি না, তিনি কি ভেবে ঐ মন্তব্য করেছিলেন। এক কবির এক কাব্যনাট্যে সত্যবতীকে ধীবরকন্যা অর্থাৎ শূদ্রানী হিসাবেই বর্ণনা করা আছে। মহাভারত কিন্তু তা বলে না। মহাভারত বলে, সে রাজা উপরিচরবসুর কন্যা। সেই ধীবরগৃহে পালিত ক্ষত্রিয়ানী এবং ব্রাহ্মণঋষি পরাশরের মিলনে ব্যাসদেবের জন্ম। দ্বিতীয়তঃ তিনি জ্ঞানী এবং নির্লোভ। এইসব কারণে তাঁকে কেবল ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদন করতে কুরুকুলে আহ্বান করা হ'য়েছিল। রাজবংশে স্বীকৃতি দিতে তো নয়। যে কোন ব্রাহ্মণই একাজ করতে পারতেন। সত্যবতীর কাছে সব কাহিনী শুনে ভীষ্মরও এঁকেই যোগ্যতম ব্যক্তি মনে হয়, তাই ব্যাসদেবকে কুরুকুলে নিয়ে আসা হয় অনুনয় ক'রে। কেবলই পুত্র উৎপাদন করতে। আর একটা

কথা—সত্যবতী ক্ষত্রিয় কন্যা না হ'লে শান্তনুর সঙ্গে তার বিবাহ স্বীকৃত হ'তো বা তার পুত্রকে রাজত্ব দেওয়াটা মেনে নেওয়া হ'তো—এমনটা মনে হয় না আমার! ধীবররাজা হয়তো রাজ্যসুখ থেকে বঞ্চিত সত্যবতীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ঐরকম শর্তের কথা বলেছিলেন :

ইন্দিরা ॥ তা, বর্ণবিভাগ হয়তো ছিল, কিন্তু কড়াকড়ি কি ছিল? পৌরাণিক যুগে নারীদের অনেক স্বাধীনতাও তো ছিল।

কথক ॥ এক সময়ে হয়তো নারীদের স্বাধীনতা একরকমের ছিল। কিন্তু তা বদলে যেতে থাকে, কমে যেতে থাকে। উদ্দালকের গল্প একরকম, তারপরেই ক্রমশঃ নারীদের স্বাধীনতা কমে যেতে থাকে। সত্যবতী, তারপর অম্বিকা-অম্বালিকা, গান্ধারী-কুন্তী—পরিবর্তনটা বেশ স্পষ্ট আঁচ করা যায়। যায় না? আর তেমনই বর্ণ বিভাগের বাড়াবাড়িও ক্রমশঃ শুরু হ'য়েছিল। যুগের এই ক্রমশঃ পরিবর্তনটা কিন্তু বেশ ধরা পড়ে আমাদের চোখে।

ইন্দিরা ॥ অনেকে বলেন তো, মানে, বর্ণ বিভাগের ভিত্তিটা তো কর্মসূত্রে নির্ধারিত হ'য়েছিল, জন্মসূত্রে তো নয়।

কথক ॥ তাই-ই বটে। আমিও তাই-ই শুনেছি। কিন্তু তাই কি থেকেছিল? যেমন ধরো—'সব মানুষ একভাবে থাকব, খাবারদাবার সমানভাবে ভাগ ক'রে খাব'—এরকম একটা সুন্দর ভাবনা —তার কি হ'লো? অত সরল সুন্দর কি রইল? তা, একথাটা হঠাৎ ব'লে ফেললাম ; হয়তো ব'লে বসবে এর সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক? তুলনা কি হয়? হয় না-ই হয়তো। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি, যা যেমন ভাবা হয় তা তেমন থাকে না, একটা ভাবনা আঁকড়েই সমাজ চলে না। আধুনিককালের, আমাদের এই দেশেরই অনেক গল্পো তোমাকে বলতে পারি। এক ভেবে এক নীতি ঠিক করা হ'য়েছিল, কয়েক বছর পরে তা কার্যকর করতে গিয়ে আগুন জ্বলে গেল। কিন্তু সে কথা থাক। সমাজ যত বদলায়, জটিলতা তত বাড়ে। তখন সরলচিন্তায় সত্যতে পৌঁছবার যে চেষ্টা তা হেরে যেতে থাকে। আর সমাজেরই কল্যাণে কোন নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা হ'লো অথচ পরে দেখা গেল সেই নিয়মটা বেড়ি হ'য়ে গেছে—এসব তো তোমরা সবাই জানো মা! ছি-ছি, এসব তোমাকে আমি কি শেখাবো! তুমি কত পড়াশুনো করেছ।

ইন্দিরা ॥ না, না। তবু, কি বলছিলে বল।

কথক ॥ ঐ তুমি বললে না, জন্মসূত্রে তো নয়, কর্মসূত্রেই নির্ধারিত হ'তো বর্ণবিভাগ! তাহলে তো মা, কর্ণকে নিয়ে এত গোল বাধার কিছু ছিল না। সে তো সূতের কাজ করেনি।

বরাবর ক্ষত্রিয়ের মত থেকেছে, অঙ্গরাজ্যের রাজাও নাকি হ'য়েছিল ! রাজকার্য করতে অবশ্য দেখি না, সর্বদা হস্তিনাপুরেই দেখি তাকে, অঙ্গরাজ্যে রাজত্ব করছে এমন কোন গল্প তো এখনো খুঁজে পাইনি। তা সে যাই হোক—ক্ষত্রিয়কর্ম ক'রেও তো ক্ষত্রিয় ব'লে স্বীকৃত হয়নি সে ! তাহলে কুন্তী এগিয়ে এসে তাকে স্বীকৃতি দেয়নি ব'লে দোষারোপ করবারও প্রয়োজন ছিল না ! আপন কর্মের জোরেই সে ক্ষত্রিয় হ'য়ে যেত ! কিন্তু তা তো হয়নি। তাহলে নিশ্চয়ই তখন বর্ণবিভাগটা তুমি যে হিসেবে বলছ সেই হিসেবে আর ছিল না। কেবল শূদ্রানীর পেটে জন্মেছে ব'লেই তো বিদুর রাজা হ'লো না ! সামান্য কুটীরে সূতরমণীকে বিবাহ ক'রে দিনযাপন করল !

কেন ?

তাই তো ব'লি অত সহজ ছিল না মা !

ইন্দিরা ॥ কিন্তু দেখ, কর্ণ তখনো পর্যন্ত কলঙ্কিত নয়, সে কুৎসিত দর্শন নয়, সেই-ই একমাত্র ধনুকটা তুলতে পেরেছিল—তবুও কেন—

কথক ॥ একি কথা হ'লো মা ? কলঙ্কিত না হ'লেই, কুৎসিতদর্শন না হ'লেই একটা মেয়ের তাকে ভালোলাগতে হবে ? কোন একটি কুৎসিত মানুষকে একটা মেয়ে ভালোবাসার জন্য বরণ ক'রে নিল, দেখনি এমন ? আমি দেখেছি গো ! স্বচক্ষে দেখেছি ! আর সে কি গভীর ভালোবাসা ! তা সে যাই হোক, আমার যেমনটি মনে হয় তেমনটিই ব'লি—আমার মনে হয় কর্ণকে তার পছন্দ হয়নি ব'লে সে ঐ কারণ দেখিয়ে এড়িয়ে গেছে। আবার এমনটা হ'লেও আশ্চর্য্য হবো না—জাম্বুলাখ্যানের মতো এই 'সূতপুত্র' ব'লে প্রত্যাখ্যান করাটাও মুখে-ফেরা গল্প, ঢুকে গেছে ওখানে। তবু সেটা ছেড়ে দিয়েই ব'লি, কর্ণ যদি ধনুকটা তুলতে না পারত তবে আর তার কিছু বলবার প্রয়োজন হ'তো না। যেমন অন্য রাজাদের বেলাতেও হয়নি। ধনুকটা তুলে ফেলবার পরই তার মনে হ'য়েছে আপত্তিটা তার এক্ষুনি জানানো উচিত।

আর তুমি যে যে কারণ সত্ত্বেও দ্রৌপদী কর্ণকে প্রত্যাখ্যান করেছে ব'লে দোষ দিলে, আমার তো ঐসব কারণেই দ্রৌপদীকে অ-সাধারণ মেয়ে ব'লে মনে হয় গো ! রাজবেশী, সুদর্শন, ঝলমলে কর্ণকে পছন্দ না ক'রে সে মুগ্ধ হ'য়ে উঠল এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষুককে দেখে ! ঐ সেই দ্রুপদের মত বিখ্যাত এবং ধনীরাজার আদরের মেয়ের ভ্রমরচক্ষু দু'টি, অর্জুন এসে দাঁড়াতেই স্থির তাকিয়ে রইল তার

দিকে,—সেই কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকবেশী পুরুষটির দিকে। সে তো তখন জানে না—এই-ই অর্জুন। কেউই কল্পনা করেনি। মহাভারত তো বলে, পরের দিন অনেক কৌশল ক'রে তবে দ্রুপদরাজা নিশ্চিত হ'য়েছিল— হ্যাঁ এরা পাণ্ডব এবং ঐ যুবকই হ'লো অর্জুন! কিন্তু তার আগেই তো দ্রৌপদী নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে ঐ ভিখারীর হাত ধ'রে কেমন বেরিয়ে এসেছিল প্রাসাদ থেকে! পুলকে! আবেশে! মা, এ কাহিনী আমার কাছে দ্রৌপদীকে অ-সাধারণ ক'রে তোলে।

আর একটা দিক ভেবে দেখ। কর্ণ তো জানে সে সূতপুত্র ব'লেই পরিচিত। আর নিজেকে সে রাধেয় ব'লেই পরিচয় দেয়। অধিরথকে ভক্তিভরে সর্বসমক্ষে পিতা ব'লে প্রণাম করে। তাহলে যখন 'উচ্চকুলশীলসম্পন্ন ক্ষত্রিয়'দের আহ্বান করা হ'চ্ছিল তখন সে-ই বা উঠে গেল কেন? সে তো জানতো সমাজের নিয়ম। অনেকে আবার বলেন, আমি শুনেছি, সেই রাগেই কর্ণ প্রতিশোধ নিয়েছিল পাশাখেলার সভায়। জানি না তুমিও তেমনটি ভাব কিনা। কর্ণকে বেশ সহানুভূতি দেখিয়েই বলে সব এমন কথা! আচ্ছা, একটা মেয়ে তোমাকে বিয়ে করতে চাইল না ব'লে তুমি সুযোগ পেয়ে একটা সভার মধ্যে তার কাপড় খুলে নিতে বলবে?

ইন্দিরা ॥ (চোখে হাত চাপা দেয়) ছি-ছি!

কথক ॥ আমার মনটাও 'ছি-ছি' ক'রে ওঠে মা! এটা পড়ার পর থেকে কর্ণকে বীর ব'লে স্বীকার করবার কোন ইচ্ছে হয় না। যে একটা অসহায় মেয়ের কাপড় খুলে নিতে বলতে পারে প্রকাশ্য সভায়, সুযোগ পেয়ে, সে আর যাই-ই হোক, বীর নয়। কোন মহত্ত্ব আর তার প্রাপ্য থাকে ব'লে মনে হয় তোমার? যাই-ই ঘ'টে থাকুক তার জীবনে, এটা কোনো বীরের কাজ নয়; একে পুরুষ বলতেই লজ্জা করে।

একটুখানি চুপ ক'রে থাকে তারা। তারপর ইন্দিরা আবার বলে—

ইন্দিরা ॥ আর একটা কথা বলব?

কথক ॥ বলবে বৈকি! বল!

ইন্দিরা ॥ তুমি যে ভীমকে কেমন প্রেমিক ক'রে তুলেছ, এটাও কিন্তু ভীম সম্পর্কে আমাদের যা পরিচিত ছবি, তা নয়।

কথক ॥ পরিচিত ছবিটা কি? পেটমোটা এবং মাথামোটা, তাই না? তা, 'নাথবতী...' পালার শেষ অংশটার জন্য তুমি কথাটা

তুলছ তো ? ওটা মহাভারতে নেই। এই অংশটা বর্ণনা করার আগে পালার মধ্যেই আমি ব'লেও দিই সেকথা। ওটা ইরাবতীদিদির বর্ণনা। উনি এই বর্ণনাটা দেবার আগে বলেছেন, 'এটা নারতি'—অর্থাৎ নারকেলের যে অংশটা একেবারে কাজে লাগে না, ফেলে দেওয়া হয়,—সেই অংশটার মতই এই লেখাটুকু তোমরা ফেলে দিতে পার— এটা নিছকই আমার কল্পনা। — সেই অসাধারণ কল্পনাটাই আমাকে ভাবাল। এবং তখন মহাভারত খুঁজে দেখি ভীম মোটেই পেটমোটা নয়—সে 'বৃকোদর'—বৃকের মতন উদর যাহার। সে সুপুরুষ। তার শরীরটা সাধারণ মাপের চেয়ে অনেক বেশি বড় ব'লে তাকে হয়তো একটু বেশি পরিমাণে খেতে হ'তো। কিন্তু পেটমোটা নয় সে। মাথামোটাও নয়। সে মাঝে মাঝে যেসব কথা বলেছে, দায়িত্ব নিয়েছে, তাতে তার বোধশক্তি প্রখর ব'লেই মনে হ'লো তখন। আর কি যে অবাক হ'লাম, বিশেষ ক'রে সেই জায়গাটা প'ড়ে, যেখানে উপকীচকদের হত্যা ক'রে দ্রৌপদীকে বাঁচাল সে। তারপর যেখানে সে তার চারভাই এবং মাকে কোলে পিঠে ক'রে সুড়ঙ্গপথ পার হ'চ্ছে! বনবাসে একা রাত জেগে তাদের রক্ষা করছে! আর বার বার দেখেছি পাঞ্চালীর অপমান নিয়ে তার মুখে ক্ষোভের কথা। এমন কি যুদ্ধের পরে রাজত্ব পেয়েও সেই কতদিন আগে দ্যূতসভায় ধৃতরাষ্ট্র পাঞ্চালী সম্পর্কে কেমন লোভীর মত উক্তি ক'রেছিল সেকথা সে ভুলতে পারেনি, তখনো না। সে-অপমান কাঁটার মতন লেগে থাকত তার গায়ে। হিড়িম্বাকে জোর ক'রে চাপানো হ'য়েছিল তার ওপরে এবং সে খুব পষ্ট ক'রে ব'লে দিয়েছিল যে, সে যেতে পারে হিড়িম্বার সঙ্গে কিন্তু পুত্র জন্মালে আর সে হিড়িম্বার সঙ্গে সহবাস করবে না, ফিরে চ'লে আসবে। সেই সর্তেই হিড়িম্বা রাজী হ'য়েছিল। কোন বিয়ে-টিয়ে হয়নি। পরেও ভীমের অন্য বিবাহের উল্লেখ প্রায় পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজে কেবল একটা নাম পেয়েছি—'কালী'। সে কে, কিভাবে বিবাহ হ'লো, তার কোনো বর্ণনা আমি এখনো খুঁজে পাইনি। এইরকম আরো অনেক কারণে আমার মনে হ'য়েছে যে ইরাবতীদিদি ঠিকই বলেছেন—ভীম দ্রৌপদীর প্রতি একানুগ ছিল। আর ভীমের ঐ অপ্রকাশিত, উচ্ছ্বাস চেপে-রাখা ভালোবাসা আমাকে ভীষণ নাড়া দিল। তাই ভীমকে আমার এইরকমই মনে হয়। কি করব বল!

সেদিনের কথাবার্ত্তা মোটামুটি এইরকম জায়গাতেই শেষ হ'য়েছিল। কিন্তু সেই

থেকে ইন্দিরা কথকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করে। কথকের পালা দেখে।

একদিন আবার দুজনের দেখা। পথেই। আবার ইন্দিরা তাকে টেনে নিয়ে যায় কোথাও, কাছের কোন পার্কেই হোক, কিংবা চায়ের দোকানেই হোক—

কথক ॥ কি গো মা? আজ আবার কি জেরা করবে?

ইন্দিরা ॥ না না, জেরা নয়, শুনব। তুমি কিছু মনে করো না। যেদিন থেকে তোমার নতুন পালা 'কথা অমৃতসমান' দেখেছি জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হ'য়েছে। তুমি তোমার পালায় কুন্তীকে বড় করেছ—

কথক ॥ বড় 'করেছি' ? আচ্ছা বেশ, বল।

ইন্দিরা ॥ না, বলছি কি, তোমারটা দেখলে চরিত্রটাকে বেশ বড় মাপের মনে হয়। কিন্তু পাপ তো করেছিল সে। ভাসিয়ে তো দিয়েছিল কর্ণকে। ও যদি স্বীকারও করত পরে তাহলে হয়তো যুদ্ধটা—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধটা হ'তো না।

কথক ॥ প্রথম কথা বলি, একা কর্ণের জন্যে তো যুদ্ধটা হয়নি। কর্ণ-র কাজ একটা ছিল, পাণ্ডবদের প্রতি তার বিদ্বেষ ছিল ব'লে সে দুর্যোধনকে ক্রমাগত উত্তেজিত করত। কিন্তু কেবল সে জন্যেই তো নয়। কর্ণের আবির্ভাবের বহু পূর্বে ভীমকে চ্যাংদোলা ক'রে ঘুমন্ত অবস্থায় গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হ'য়েছিল। অস্ত্রপরীক্ষার পরে কর্ণ পাণ্ডবদের নির্বাসিত করতেই বলেছিল। ভাবটা অন্ততঃ তাই ছিল। দুর্যোধনের বুদ্ধিতে জতুগৃহ নির্মিত হয়। তাছাড়াও এর মধ্যে আরো অনেক জটিলতা আছে, গ্রন্থি আছে। এত সহজে ব'লে দেওয়া যায় না কর্ণ তার জন্মকথা জানলেই যুদ্ধটা হ'তো না। আর কর্ণ তো জেনেওছিল যে সে কুন্তীর পুত্র। কিছু ফল কি হ'য়েছিল? কৃষ্ণ যখন তাকে ঐ 'সংবাদ' দেয় 'ভেদনীতি' প্রয়োগ করবার জন্য, তখন কিন্তু কর্ণ জানে যে সে কুন্তীর পুত্র।

তারপর কুন্তীও যখন পরিচয় দেয় যুদ্ধের পূর্বে, হ্যাঁ, যুদ্ধের পরে নয়, পূর্বেই কর্ণকে গিয়ে বলেছিল কুন্তী—তখনো সে-বলার কোন মর্যাদা দেয়নি কর্ণ।

আর হিসেব কি এত সোজা? জীবনটা বড় জটিল। বড় কঠিন। এখনো বুঝতে পারনি তেমন ক'রে, না? বুঝবে, বুঝবে। —এখানে এত সহজে এটা 'পাপ' আর ওটা 'পুণ্যি' এই ব'লে লেবেল মেরে দেওয়া যায় না। সূর্যদেব কিভাবে তাকে গ্রহণ করেছিল সে বর্ণনাটা একটু প'ড়ে দেখো দিকি। কুন্তী তখন মাত্র এক কিশোরী। সূর্য তো তা নন। আর যদি স্বীকার করাটা অতই সোজা ছিল তবে

পুত্রকে ভাসিয়ে দেবারই বা কি দরকার ছিল ? —আর পরে ? পাণ্ডুর কাছে ?

ইন্দিরা ॥ হ্যাঁ, যখন পাণ্ডু তাকে পুত্রের জন্ম দিতে বলল, তখন ? তখন তো ওর ব'লে দেওয়া উচিত ছিল ! ছিল না ?

কথক ॥ দেখ, প্রথম কথা হ'লো সে পাণ্ডুকে খুব বেশি ভালোবেসেছিল। এক মস্তবড় রাজবংশে রানী হ'য়ে এসেছিল সে। অত সহজে কি এরকম কথা স্বীকার করতে পারে ? এ তো শুধু তার ব্যক্তিগত ব্যাপার হবে না তখন ! তখন ঐ পরিবার, বংশ, রাজত্ব—সব কিছু জড়িয়ে যাবে না ?

এ ছাড়াও অনেক কথা আছে, শুনবে ?

ইন্দিরা ॥ শুনবো বল !

কথক ॥ পাণ্ডু যখন কুন্তীকে পুত্রের জন্ম দেবার কথা বলেছিল তখন ছয় প্রকার পুত্রের মধ্যে কানীনের নামও তো করেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিল, 'ক্ষেত্রজপুত্র শ্রেষ্ঠ ও ধর্মফল দান করে বলিয়া মনুষ্যগণ তাহাই লাভ করিয়া থাকেন। অতএব কুন্তি ! আমার নিজের সন্তানোৎপাদন শক্তি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি যে, তুমি সবর্ণ বা উত্তমবর্ণ পুরুষ হইতে পুত্রলাভ কর।' এই ব'লে সে ক্ষেত্রজপুত্রের গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে শারদণ্ডানীয়র কাহিনী বলে। এবং বলে—

—'তুমিও সেইরূপ আমার আদেশ অনুসারে কোন বিশিষ্ট তপস্বী ব্রাহ্মণ দ্বারা পুত্র উৎপাদনের জন্য সত্বর চেষ্টা কর।'

কুন্তী পাণ্ডুকে খুব ভালবাসে ! পাণ্ডু ছাড়া অন্য কোন পুরুষকে সে ভাবতে পারে না। সে বলে—

—'আমি আপনার ধর্মপত্নী, এবং আপনাতেই সর্বতোভাবে আসক্ত। সুতরাং আপনি কোন প্রকারেই আমাকে এরূপ বলিতে পারেন না।'

এই কথা ব'লে সে পাণ্ডুকে ব্যুষিতাশ্বের কাহিনী বলে। ব্যুষিতাশ্ব ও ভদ্রার কাহিনী। এবং বলে—

—'অতএব মহারাজ আপনি তো তপোবল এবং যোগবলশালী ; সুতরাং আপনিও তো সেইরূপেই আমার গর্ভে মানসপুত্র জন্মাইতে পারেন।'

পাণ্ডু বলে,—অত ক্ষমতা আমার নেই। আর তাছাড়া, 'পূর্বকালে সকল স্ত্রীলোকই অনবরুদ্ধ ছিল, স্বাধীন ছিল, কিন্তু—'

এই কথা ব'লে সে উদ্দালকের কাহিনী বর্ণনা করে। এবং বলে—

—'যে রমণী ক্ষেত্রজপুত্র উৎপাদন করিবার জন্য পতির আদেশ পাইয়াও সে আদেশ পালন করিবে না, তাহারও এইরূপ পাপই হইবে। তাছাড়া বেদব্যাস হইতে আমাদের জন্মবৃত্তান্তও তোমার জানা আছে। ধর্মসঙ্গত হউক বা না-হউক পতি পত্নীকে যাহা বলিবেন, পত্নী তাহাই করিবেন, ইহাও ধর্মজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন। তুমি আমার নিয়োগ অনুসারে কোনো তপস্বী ব্রাহ্মণ হইতে গুণবান পুত্র উৎপাদন কর।'

এই কথার পর আর কি কুন্তী তার কানীন পুত্রের কথা বলতে পারে? বলা সম্ভব ছিল সব খুলে? আমার বোধ হয় সে এর পরে আর ব'লে উঠতে পারেনি।

তখন সে পাণ্ডুকে দুর্বাসার কাহিনীটি জানায়। আর পাণ্ডু তখন কুন্তীকে ধর্মকে আহ্বান করতে আজ্ঞা দেয়। তারপর, নিজের ইচ্ছানুসারে পবন এবং ইন্দ্রকে আহ্বান করায়।

তিন পুত্র লাভ করার পরেও চতুর্থবার—'আরও পুত্র লাভ করিবার লোভে পুনরায় কুন্তীকে অনুরোধ করিবার ইচ্ছা করিলেন।'

কুন্তী তখন বলেন—

—'ইহার পর বিপৎকালেও এইভাবে চতুর্থপুত্র উৎপাদন করা মুনিরা সঙ্গত বলিয়া মনে করেন না। কারণ তৃতীয়ের পর চতুর্থ পর-পুরুষ-সংসর্গ করিলে সেই স্ত্রী স্বৈরিণী এবং পঞ্চম পর-পুরুষ-সংসর্গ করিলে বন্ধকী বলিয়া গণ্য হয়। হে জ্ঞানী! আপনি এই ধর্মের বিষয় জানিয়াও তাহা লঙ্ঘন করিয়া পুত্রের জন্য অনবধানতাবশতই যেন, আমাকে তাহা বলিতেছেন কেন?'

তা বল না মা, এরপরে ধর্মজ্ঞানসম্পন্ন, তপোসাধনে প্রবৃত্ত পাণ্ডুকে কি মনে হয়? একটু খুলেই বল!

এবং সত্যিই সে কুন্তীর কাছে মন্ত্র চেয়ে এনে মাদ্রীকে বলেছিল—

—'তুমি একবার মাত্র যে কোন দেবতাকে স্মরণ কর। তাঁহা হইতে নিশ্চয়ই তোমাব উপযুক্ত পুত্র হইবে।'

কুন্তীর বেলায় সে যেমন আজ্ঞা দিয়ে, যেন শাস্ত্রানুসারে, পুত্র-উৎপাদনকারী নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিল, মাদ্রীর ক্ষেত্রে তেমন বিশেষ দেবতা সে নিয়োগ ক'রে দেয়নি।

তখন কি মনে হবে পাণ্ডুকে?

তুমি অবশ্য পাণ্ডুর কথা তোলোনি। কিন্তু এই তোমাদের মতনই একটি ছেলে এসে আমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, পাণ্ডুর ছবিটা আমি অমন ক'রে আঁকলুম কেন। এ-কথায় সে-কথাটা মনে প'ড়ে গেল। একটু প'ড়ে

দেখো। এসবই আমি সিদ্ধান্তবাগীশমশায়ের অনুবাদ থেকে বললুম। মাদ্রী সম্পর্কেও যদি সন্দেহ থাকে একটু দেখো ঐ জায়গাটা প'ড়ে। কি জানি মা, আমার তো ঐরকমই অনুভব হয়। আমার বারবারই মনে হয় কি জানো মা, সহজে বিচার করাটা ঠিক হয় না।

ইন্দিরা ॥ (চিন্তিত হ'য়ে) কিন্তু লোকে তো তাই করে, করে না?

কথক ॥ আমাদের কপাল! লোকে এক-একজন সম্পর্কে এক একরকম ক'রে বিচার করে। কুন্তীর সময়ে তাকে কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়ে দেবে। অথচ আবার অন্য কত চরিত্র কত সহজেই সহানুভূতি পেয়ে যায়। এই আমাদের সমাজেও ঠিক যেমনটি হ'য়ে থাকে। একজন অনেক অন্যায় ক'রেও কেমন পার পেয়ে যায়। আর অন্যজনকে হয়তো কেবল সইতে হয়, কেবলই বহন ক'রে যেতে হয়। হয় না? দেখনি?

কিছু মনে ক'রো না মা, তুমি বয়সে ছোট, আর তোমাকে বেশ লেগেছে আমার, তাই এসব ব'লে ফেললাম। আজ উঠি, কেমন?

ইন্দিরা ॥ শোনো, তোমার পালা আবার কবে আছে?

কথক ॥ এই তো, আগামী শনিবার।

সেদিন 'কথা অমৃতসমান' পালা শেষ ক'রে কথক যখন তার সাজগোজ ব'দলে, রঙ পরিষ্কার ক'রে বেরোচ্ছে ততক্ষণে সব দর্শক চ'লে গেছে। আসর ফাঁকা। হঠাৎ কথকের নজরে পড়ে—সেই মেয়েটি—সেই ইন্দিরা না কি যেন নাম বলেছিল, একা ব'সে আছে বাইরেটাতে।

কথক ॥ কি গো? তুমি এখানে ব'সে আছ?—পালা দেখলে নাকি? —কেমন হ'লো পালা?

ইন্দিরা ॥ (খুবই অন্যমনস্ক, একটু বিহ্বলও) জানি না।

কথক ॥ (বিস্মিত) জান না?

ইন্দিরা ॥ না। সত্যিই জানি না। আমি তো আগেও দেখেছি এই পালাটা। কিন্তু কেন যেন তখন অনেক কথা খেয়াল করিনি! আচ্ছা ঠাকরুণ, সত্যিই সত্যবতী ঐরকম বুড়ী হ'য়ে অবহেলায় ম'রে গিয়েছিল? আর কিছু লেখা নেই?

কথক ॥ আছে বৈকি। লেখা আছে ব্যাস তাকে বনবাসে যেতে বলল, আর দুই ছেলের বউ নিয়ে সে তপস্যা করল। তারপর ম'রে গেল। আর কিছু লেখা নেই।

ইন্দিরা ॥ ভীষ্ম কেন রাজা হ'লো না? সত্যবতী তো ক্ষমা চাইল, অনুনয় করল। তবু?

কথক ॥ কে জানে মা অমনই হয়তো ছিল সেই যুগ। কিংবা অমনিই হয়তো ছিল ভীষ্মর স্বভাব ! দেখ, সে দায় নিয়েছে অনেকখানি। অধিকার ফলায়নি কোনো। অনুনয় করলেও প্রত্যাখ্যান করেছে। ইরাবতীদিদি বলে—ভগবান জানেন ঐ প্রতিজ্ঞা রেখে কি মোক্ষ লাভ করেছিল ভীষ্ম ! কি অপমান যে সহ্য করেছিল শেষ সময়ে ! সে অপমান বুঝি ঐ ভীষণ প্রতিজ্ঞার কষ্টের চাইতেও অনেক বেশি কষ্টের।

ইন্দিরা ॥ কি হ'য়েছিল ?

কথক ॥ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কি ভীষ্মর কাম্য হ'তে পারে ? তাই যত সে যুদ্ধ বন্ধ করতে চেয়েছে ততই অপমানিত হ'য়েছে নিজের নাতিদের কাছে।

ইন্দিরা ॥ দুর্যোধনের কাছে ?

কথক ॥ হ্যাঁ। কর্ণ-শকুনির কাছেও। আবার যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণর কাছে। অর্জুনের কাছেও।

ইন্দিরা ॥ অর্জুনের কাছেও ?

কথক ॥ হ্যাঁ গো। অর্জুনের কাছে তার সবচেয়ে অপমান, অর্জুন তাকে রথ থেকে ফেলে দিয়েছিল। জীবন বড় অদ্ভুত তো ! সারা জীবনে অনেক ঝামেলা তার ঘাড়ে চাপিয়েও জীবনের সাধ মেটেনি। অপমানিত হ'য়েছে কি জীবনে সে একবার ? বার বার। ঐ ভেবে দেখ—সত্যবতীর আজ্ঞায় কাশীকন্যাদের হরণ করতে গিয়ে কত কটু কথা শুনতে হ'লো। এবং তারই ফলে অম্বার অপমান শাল্বর কাছে, আর তারই ফলশ্রুতি হ'লো—শিখণ্ডী।

তারপর ধরো—ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয়যজ্ঞের সভায় ; মনে আছে ? তারপর আরো কত কতবার। আর শেষকালে যখন সে রথ থেকে প'ড়ে গেল তার গায়ে এত তীর বিঁধেছিল যে তার শরীরটা ভূমির ওপরে পড়তে পেল না, তীরের ওপরে রইল। আর ঐভাবে ছ'মাস বেঁচেছিল ভীষ্ম। তা, চোখে তো সে দেখতে পেত, তাই ঐ চোখ দিয়ে সে কুরুবংশের ক্ষয় দেখেছে ; কানে তো সে শুনতে পেত, তাই ঐ কান দিয়ে সে যুদ্ধের পরে কুরুবধূদের বুকফাটা কান্না শুনেছে। কি জানি, যা সে করেছে তা ভালো, না মন্দ !

চল, চল মা। —আরে, কথায় কথায় কত রাত হ'লো বল দিকি।

সেদিন কথকের পালার অভিনয়। আসরের আঙিনায় কথক অন্যদিনের চেয়েও আরো অনেক আগে পৌঁছে গেছে সেদিন। তখনো তার দলের সবাই ঠিক জোটেনি এসে। কথক ঠেস দিয়ে এক জায়গায় ব'সে ঝুলি থেকে তার

আসরে পরবার গয়না, পোষাকগুলো বার ক'রে দেখছিল। দেখা গেল, গয়নাগুলো একটু সারাতে হবে। সে নিজেই কিছু সরঞ্জাম বার ক'রে সেইসব ঠিকঠাক করছিল। হঠাৎ সেখানে ইন্দিরার আবির্ভাব—

ইন্দিরা ॥ তুমি এখানে এসে বসে আছ? এই কোণের মধ্যে! আর আমি কত জায়গায় খুঁজে এলাম—

কথক ॥ বোসো মা। এত তাড়াতাড়ি? কি ব্যাপার?

ইন্দিরা ॥ ঐ, আবার যেদিন পালা দেখলাম সেদিন তোমার সঙ্গে তো আলাদা কথাই হ'লো না। এত লোকজন।

কথক ॥ ব'লেছিলাম না, হট্টগোলের মধ্যে গহন কথা হয় না?

ইন্দিরা ॥ (সায় দেয়) তাই আজ তাড়াতাড়ি চ'লে এলাম।

কথক ॥ কেমন লাগল সেদিন?...জান না?

ইন্দিরা ॥ আসলে কি জানো, এখন আমার মনে হ'চ্ছে তুমি ঠিকই বলেছ। এক কথায় এ ভালো, ও মন্দ—এমনটা ঠিক ক'রে দেওয়া যায় না। অন্ততঃ সবসময়ে যায় না। যেমন,
গান্ধারীকে আগে কেমন 'দেবী-দেবী' লাগত। এখন খুব মানুষের মত লাগছে। তেমনি কুন্তী—ওকে অনেক কাজ করতে হ'য়েছে বাধ্য হ'য়ে, আর সবাই ওকে পাপী মনে করেছে।
তাই বলছি, তোমার পালাও কেবল 'ভালো' বা 'মন্দ' বললেই কি ঠিক বলা হবে?

কথক ॥ তবে?

ইন্দিরা ॥ আসলে ভাবতে হবে। যেমন, তুমি ঐ যে আইনের কথা বলেছ, হস্তিনাপুরের ন্যায্য অধিকার নিয়ে—এটা আমার এমন লেগেছে! আমার কেমন মনে হ'তো দুর্যোধনেরাই তো প্রকৃত উত্তরাধিকারী, সবাই সেইরকমই আলোচনা করে। হ্যাঁ ঠাকরুণ! বলে! আজকাল অনেকেই বলে! আমি আমার কলেজেও মাষ্টারমশাইদের বলতে শুনেছি, এখনকার কিছু নাটকেও দেখেছি— বলে, —পাণ্ডবদের রাজত্ব পাবার ব্যাপারটাই বাজে, ওদের অধিকারই নেই কোনো। ওরা তো পাণ্ডুর পুত্র নয়, জারজপুত্র। জোর ক'রেই বলে। সেই থেকেই হয়তো মনে হ'তো পাণ্ডবেরা তো কুরুবংশের ঠিক নয়।
কিন্তু, তুমি যে ঐ বললে, তাহলে তো ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডুকেও বাতিল ক'রে দিতে হয়—তখন মনে হ'লো, সত্যিই তো, ওদের পিতাও তো কুরুবংশের কেউ নয়। কাজেই ক্ষেত্রজপুত্রের নিয়ম যদি মানতে হয়, তবে পাণ্ডবদেরও কুরুকুলের ব'লে মানতে হয়। কিন্তু ঠাকরুণ, তাহলে কার অধিকারটা ন্যায্য?

কথক ॥ সে তখনকার জ্ঞানীগুণীরা ঠিক করতে পারেনি, ক্ষত্রিয়কুল ঠিক করতে পারেনি। স্বয়ং কৃষ্ণ, তার অত জ্ঞানবুদ্ধি সত্ত্বেও, এর কোন সমাধান বার করতে পারেনি, এই জটিলতার জন্যেই তো ঐ মহাকাব্যের এত জোর! জটিলতার জন্যই তো মানুষের সমস্যা গভীর হয়, সমাজের সমস্যা গভীরতর হয়। আর সেটা প্রকাশ পেয়েছে ব'লেই তো মহাভারত— মহাভারত।

ইন্দিরা আবার একদিন উপস্থিত হয় কথকের কাছে। পালা শুরু হবার আগেই। কথক তখন সাজঘরে তৈরী হ'চ্ছে। এখন দুজনের বেশ ভাব হ'য়ে গেছে। আয়নায় ইন্দিরাকে দেখতে পেয়েই কথক হেসে বলে—

কথক ॥ কি ? নেশা লেগেছে ?

ইন্দিরা ॥ এক্কেবারে। এইরকম যে নেশা লেগে যেতে পারে মহাভাবতে, আগে তো ভাবিনি।

কথক ॥ আমার তো ঐ দশা; একদম নেশা লেগে গেছে।

ইন্দিরা ॥ মহাভারতের একটা বই সর্বসময়ে বালিশের কাছে থাকে। ঘুরতে ফিরতে চোখ বুলোই! বাড়ীতে সবাই অবাক। সবাই হাসে। কিন্তু তোমার পালা শুনলেই যে আবার নতুন চিন্তা মাথায় আসে আর উল্টেপাল্টে দেখতে ইচ্ছে করে—কি করব বল।

যেমন ধরো 'নাথবতী অনাথবৎ' ব'লে যে পালাটা তুমি করো, সেটা তো দ্রৌপদীকে নিয়েই। কিন্তু 'কথা অমৃতসমান' এ যখন আবার দ্রৌপদী আর সুভদ্রার কথা আসে, নতুন ক'রে মনে হয়, মানে আমার মনে হ'লো সেদিন—আহা কত সইতে হ'য়েছে তাদের, আমরা কি পারতাম ?

ঐ সভায়, দ্যূতসভায়, ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে যে-সব কথা বলে দ্রৌপদী, ওটা তো 'নাথবতী...' পালায় নেই। তারপরে ঐ বনবাসের অত বছর যে সুভদ্রাও দেখতে পায়নি অর্জুনকে, তাতে যে তার খুব কষ্ট হ'য়ে থাকতে পারে, এসব কেমন ভাবিইনি কখনো। তারপর ধরো, ধৃতরাষ্ট্রের কাছে যখন গান্ধারী এল, বা পাণ্ডবেরা যখন চ'লে যাচ্ছে, কুন্তী যেভাবে পাণ্ডুকে স্মরণ করছিল—কিরকম অসহায় লাগছিল।

আর ঐ ব্যাসদেবের কথাটা যখন এল—

'পৃথিবী এখন বিগত-যৌবনা'—মনে হ'চ্ছিল লোকটার কি কষ্ট! সে তো কত আগে বুঝতে পেরেছে, কিন্তু প্রতিরোধ করতে পারেনি, কিচ্ছুই করতে পারেনি।

কথক ॥ এইটে বড় সত্যি কথা। মানুষ অনেক পারে, অনেক জানে,

বুঝতে পারে, তবু এমন এক ভবিতব্য তাকে থেকে থেকে এমন এক আঁধার মধ্যে ফেলে দেয় যে চতুর্দিকের সব কিছু আঁধার লাগে—সে আলো দেখতে পায় না। কোনকিছুর কোন মানে নেই মনে হয়। এই দেখছ না, আজকে কি দাঁড়িয়েছে আমাদের দেশের অবস্থা! কি হানাহানি, খুনোখুনি! কত বলি হবে আরও তার কোন দিশা নেই যেন। তখন আঁধার-আঁধার লাগে না? মনে হয় মিথ্যাচার আর অন্যায়ের কোন শেষ নেই! এ কোন্ পাঁকের মধ্যে ক্রমশঃ তলিয়ে যাচ্ছি আমরা।

তবু মানুষ জন্মেছে ব'লেই, এসবের মধ্যেই তাকে করতে হবে, যা সে পারে, যতটাই সে পারে। জন্মেছে ব'লেই তাকে এরই মধ্যে ভালোমন্দ নির্ণয় করতে হবে। কষ্ট করতে হবে। মানুষের সত্যিই বড় কষ্ট মা, বড় অসহায় মানুষ!

ইন্দিরা ॥ ঠিক। সত্যি। ঐ যে কুরুক্ষেত্রের পরে যখন ধ্বংসের ছবিটা আসে—কি মর্মান্তিক, না?

কথক ॥ সেই যুদ্ধের আগে ঐ পরিণামটার জন্যেই তো অত ভয় ছিল সকলের। যুদ্ধ হবে, সর্বজীব ধ্বংস হবে, ভ্রাতৃহত্যা হবে, জ্ঞাতিহত্যা হবে।

ইন্দিরা ॥ সবচেয়ে আমার ধাক্কা লেগেছে তোমার জুড়ির দল যখন হাহাকার ক'রে ব'লে ওঠে—'মানবেরা করে আজি মানবনিধন!' কারণ আজও তো তাই-ই হ'চ্ছে পৃথিবীতে, আমাদের দেশে। আর তারপরে, এই কদিন আগের যে যুদ্ধ! ইরাকে!

কথক ॥ বড্ড দুঃসময়। ঐরকমই ভীত আমরা মহাযুদ্ধ নিয়ে। কুরুক্ষেত্রের পরিণতির ঐ রূপটা কতটা স্পষ্ট ছিল তখনকার মানুষের কাছে জানি না। কিন্তু আজ তো আমরা জানি—'যুদ্ধ' মানে কি, 'ধ্বংস'র অর্থ কি— তবু তো কোথাও থামা যাচ্ছে না। মানুষ ক'রেই চলেছে অন্যায়। মানুষ মারবার নানারকম নতুন নতুন কলকাঠি বার করবার জন্যেই কি মানুষকে বুদ্ধি দিয়েছিল ভগবান? আর তারই সঙ্গে দেখ কি পরিমাণ মিথ্যাচার! ভয় করে, বড় ভয় করে মা। মানুষেরই তৈরী কাঠামো যার ভিত্তিতে মানুষ আলোয় পৌঁছতে পারত সেই কাঠামোটাকে ভেঙে তছনছ ক'রে অন্ধকারে তলিয়ে যেতে যেন মানুষই বদ্ধপরিকর। কিছু মানুষ। কিন্তু কি জোর তাদের! তাদের চাপে যারা তা চায় না তারাও চুপ ক'রে যায়, চুপ ক'রে থাকে। তাই বড় ভয় করে। তাই তো আমার পালার ঐ কথাগুলো বলতে ইচ্ছে করে। তাই জন্যেই তো পালা করার কাজটা বেছে

নিয়েছি। এত কথা সেই জন্যেই তো বলা।

ঘন্টি বাজে, কথককে আসরে যেতে হবে।

কথক ॥ যাই মা, ডাক প'ড়েছে।
ইন্দিরা ॥ আজ আবার দেখব আমি।
কথক ॥ আবার ?
ইন্দিরা ॥ হ্যাঁ, ঐ যে বললাম তোমাকে, বড় নেশা লেগে গেছে। আর, আবার তোমার সঙ্গে কথা বলব। আমার যেন আরো অনেক কিছু জানার আছে।
কথক ॥ মা, আমি আর কতটুকু জানি ? কত পণ্ডিতেরা কত কথা লিখেছে! সেইসব পড়লে তোমার ভালো লাগবে।
ইন্দিরা ॥ সেসব তো পড়ছি। পড়বও। কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলব তোমার ঐ কথাগুলোর জন্যে—ঐ যেগুলো তুমি ঐ আসরে দাঁড়িয়ে বল।

যেদিন থেকে আমি মহাভারত নিয়ে কাজ করছি মঞ্চে, সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত যেসব প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছে আমাকে, তারই কিছু কিছু নিয়ে এই কথোপকথন সাজানো হ'লো। শুধু প্রশ্ন নয়, এই রকম আলোচনাও হ'য়েছে। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন বয়সের পুরুষ, মেয়ের কাছে নানা রকম প্রশ্ন শুনেছি। মন্তব্য শুনেছি। প্রশ্ন শুনেছি কথকতার আঙ্গিক ব্যবহার করা সম্পর্কে—

'সুবিধের জন্য ?'

'নিজেকেই কেবল গুরুত্ব দেবার জন্য ?'

'সাংগঠনিক কারণে ?'

এমন কত !

এসব প্রশ্ন খুব আন্তরিক মনে হয়নি। কিন্তু একটা প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে বা কিছু মন্তব্য শুনে এটুকু বলতে ইচ্ছে হ'য়েছে— যে আমার মনে হ'য়েছে, ক্রমশই আরো বেশি ক'রে, এই সব কথা যদি প্রকাশ করতে হয় তবে এটাই তার আঙ্গিক। আমাদের কল্পনার যে অর্জুন তাকে চারপাশের এই অফিসকেন্দ্রিক, শহুরে সমাজে কোথায় খুঁজে পাব ? বা দ্রৌপদী ? বা ভীষ্ম ? সত্যবতী ? নকল সোনামুক্তো প'রিয়ে কয়েকটা মানুষকে চোখের সামনে হাজির করলে 'বিষয়'টা অনেক লঘু হ'য়ে যাবে ব'লে মনে হ'য়েছিল। মনে হ'য়েছিল তার চাইতে অনেক ভালো মানুষের কল্পনার ওপরে ছেড়ে দেওয়া। মানুষ যেমন জানতে

ভালোবাসে, তেমনি কল্পনা করতেও।

একটা কথা ব'লি—'নাথবতী অনাথবৎ' এবং 'কথা অমৃতসমান' এই দুটো পালাতেই এই আঙ্গিক গ্রহণ করবার ফলে অনেকগুলো ব্যাপার, বা বলতে পারি—স্তর, একই সঙ্গে মঞ্চে ঘটানো গেছে যা অন্য আঙ্গিকে এত সহজে সম্ভব হ'তো না। যেমন অতীতের এক কাহিনী বর্ণনা করার পরই কথক তার সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে, মন্তব্য করতে পারে, প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, ব্যাখ্যা করতে পারে, টিপ্পনিও কাটতে পারে। তেমনিই আবার কথক স্পষ্ট দেখতে পারে অতীত ঘটনা, শুনতে পেতে পারে দুর্যোধন-পুরোচনের কথোপকথন, দু-তিনটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা—কেবল 'কথা' দিয়েই যার ছবি তৈরী করা যায়—ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার কেমন মনে হয় যে, এইসব করতে পারার ফলে বিষয়ের গুরুত্বটা তার প্রাপ্য স্থান পায়, এখানে যার খুব প্রয়োজন ছিল। বিষয়ের জন্যই এই আঙ্গিক নির্বাচন। আঙ্গিকের জন্য বিষয় নয়। যাঁরা কাজ করেন তাঁরা সবাই একথা নিশ্চয়ই গভীরভাবে অনুভব করেন।

বর্ণনাত্মক থিয়েটারের সুবিধা কি কি এ সম্পর্কে একটা লেখা আমাকে লিখতে হ'য়েছিল একটা গবেষণাপত্র হিসাবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে বিশদ লেখা আমার উচিত নয়। বরং কোন মনোযোগী দর্শক যদি ভালোবেসে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন কোনদিন, তাহলে বুঝতে পারব আমি যা যা ভেবেছি, যা যা ভেবে কাজটি করেছি তা সত্যিই দর্শকের কাছে পৌঁছেছে কি না। যদি এই আঙ্গিককে ব্যবহার ক'রে সত্যি কোন 'কাজ' হ'য়ে থাকে তো তার মূল্যায়ন করবেন দর্শক। তাঁদের যদি ভাললাগে, নাড়া দেয়, তো সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। নইলে কেন কি করেছি, কিভাবে করেছি এসব ব্যাখ্যা দিয়ে কোন লাভ নেই। যা করেছি, যতটুকু করেছি, তাতে যদি দর্শকের ভালোলেগে থাকে, প্রশ্ন জেগে থাকে, তবেই ধন্য মানব।

হ্যাঁ, কথক বোধ করেছে লোকে জানতে চায়। তাকে যে বারবার উত্তর দিতে হয়। আর তখন সে ভীষণ কৃতজ্ঞ হয় জীবনের প্রতি। ইন্দিরার মতন অনেককে সে দেখেছে যাদের জানবার আগ্রহ প্রবল। তারা তাদের নিজেদের বোধ দিয়ে অনুভব করতে চায় এই পৃথিবীর সমস্যা, মানুষের দুঃখ, অসহায়তা। আর কথক ভেবেছে—হ্যাঁ, এখনো মানুষ আছে এমন, যারা মানুষকে ভালোবাসে। মানুষকে ভালোবাসে ব'লেই এই নগ্ন, ভয়াবহ ধ্বংসলীলায় তারা বিচলিত হয়, তাদের বুকের মধ্যে কষ্ট হয়।

চতুর্দিকের অপমান, গ্লানি, অবিশ্বাস, প্রতারণা—এসবের মধ্যেও কথক এবং আমরা ঐটুকু বিশ্বাস আঁকড়ে থাকতে চাই। ভাবতে চাই—না, আছে, এখনও কেউ কেউ আছে যারা ভালোবাসতে চায়। মরতে মরতেও যদি ঐটুকু বিশ্বাস আঁকড়ে থাকা যায়, এই পতনোন্মুখ সমাজে, এই চতুর্দিকের অবক্ষয়ের মধ্যে—আর কিই বা চাইতে পারি আমরা ?

[স্যাস্ নাট্যপত্রিকায় '৯১ সালে প্রকাশিত।]

পরবনীর কোঠিবাড়ী

কিছু কাল আগে লোকশিল্পকলা দেখবার তাগিদে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে ঘুরতে শুরু করেছিলাম। সেই সূত্রে মহারাষ্ট্রেও গিয়েছিলাম। বোম্বাই থেকে বহুদূরে একটি স্থানে পৌঁছেছিলাম যার আকর্ষণে সে হ'লো 'গোন্দেড়'—লোককলার একটি ফর্ম। একধরণের কথকতা। গোন্দেড়শিল্পী রাজারাম ভউ কদমকে দেখতেই প্রধানতঃ আমার পরবনীতে যাওয়া, বহুকষ্ট স্বীকার ক'রে। এই সুবাদেই মহারাষ্ট্রের লোকনাট্যের অনেকগুলি ফর্ম ওখানে আমার দেখা হ'য়ে গেল।

সেইখানে আমার পক্ষে একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা হ'য়েছিল—পরবনীর কোঠিবাড়ীতে যাওয়া।

কলকাতা থেকে আমি একলাই গিয়েছিলাম। বম্বে থেকে যিনি আমার সহায়তা করবেন ব'লে আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন পরবনীতে, সেই সুরেশ চিখলে এবং তাঁর পরবনীর বন্ধু রামকৃষ্ণ ঢেড়ে আমাকে বললেন--
—হয়তো আপনি যা খুঁজছেন তাতে খুব একটা কাজে লাগবে না। কিন্তু দেখুন। এঁরা যেটা করেন তা হ'লো 'বৈঠকী চিলাওনি।
বললাম, 'বেশ!' ওঁরা বললেন—সেদিনই পৌঁছেছি—
—সন্ধের মুখটায় শান্তাবাঈ-এর কোঠিতে একবার চলুন। দেখবেন, আলাপ করবেন। তারপর পরশু বন্দোবস্ত করব সকালে। সন্ধেয় তো ঠিক ওখানে হবে না।
আমি কিছু না বুঝে বললাম—'আচ্ছা।'

গল্প-টল্পের মাধ্যমে আমার ধারণা ছিল যে এরা গান টান শোনায়, হয়তো একটু মদ্য পান-টান হয় সেই সময়ে। ভাবলাম তাই এ দু'জনের ঐ সিদ্ধান্ত।
সন্ধ্যার প্রথম দিকে গেলাম সেই বাড়ীতে। সঙ্গে শ্রী চিখলে এবং শ্রী ঢেড়ে।

এই বাড়ীটি শ্রী ভউ কদমের বাড়ী থেকে খুব দূরেও নয়। যেতে যেতে

শুনলাম যাঁর বাড়ীতে যাচ্ছি তাঁর নাম শান্তাবাঈ। বাড়ীটি শান্তাবাঈ-এর কোঠি ব'লে পরিচিত। তাঁর এখন অনেক বয়স হ'য়েছে। অল্পবয়সেই শুধু নয়, অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর গানের মস্ত খ্যাতি ছিল।

আমরা একটি তিনতলা বাড়ির সামনে পৌঁছলাম। কড়া নাড়া, ডাকাডাকির পর দরজা খুলল। ঢুকেই একটি বসবার ঘর। এক অংশে ফরাস পাতা, তাকিয়া দেওয়া। একদিকে একটু পার্টিশন মত। বোধহয় ছোট কোনো ঘর। মনে হ'লো একতলাতে আর কোনো ঘর নেই। বাঁদিকে খোলা দরজা দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে। একজন মেয়ে আমাদের বসিয়ে রেখে চ'লে গেল। তারপর অনেকক্ষণ কেউ এল না। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি ঘরের সমস্ত দেওয়ালে অজস্র বাঁধানো ছবি—গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শিব-পার্বতী। এই দেবদেবীর সঙ্গেই শান্তাবাঈ এবং তাঁর বোন কুসুমবাঈ-এর ফটো। তারই সঙ্গে হেমামালিনী, নূতন, রেখা— (এবং আরও কেউ কেউ যাঁদের নাম আমি জানি না,) প্রমুখ চিত্রতারকাদের ছবি। পুরুষ চিত্রতারকা একজনই ঐ দেওয়ালে স্থান পেয়েছেন—তিনি অমিতাভ বচ্চন। তার পাশেই জওহরলাল, গান্ধীজী, এমন কি নেতাজীর ছবি।

তখনও কেউ আসছে না দেখা করতে। ধীরে ধীরে আমার সঙ্গীদ্বয়ের কাছে শুনলাম যে এটি একটি একেবারেই যাকে আমরা গনিকালয় ব'লে থাকি তাই।

শুনলাম এ বাড়িতে সাধারণতঃ ছেলে জন্মানো প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। শুনে মনে হ'লো গর্ভবতী হ'লে এরা সম্ভবতঃ কোনো গুণীনের কাছে গিয়ে জানতে চেষ্টা করে ছেলে হবে না মেয়ে। ছেলে হবার হ'লে এরা গর্ভপাত ঘটায়। কিন্তু কুসুমবাঈ-এর একটি ছেলে, সে বড় হ'য়েছে, এম্-কম্ পাস ক'রে সরকারী চাকরী করে। এর কাহিনীর জটিলতা বড় করুণ। সে প্রসঙ্গে পরে আসব।

এ বাড়ীতে দু-তিন বছর বয়সের অনেক শিশু দেখলাম। সবাই মেয়ে। কেউ হামাগুড়ি দিচ্ছে, কেউ হাসছে, কেউ আঙুল চুষছে। নানা বয়সের শিশু। কিন্তু সবারই ভবিষ্যৎ ঐ এক। আমার গা কেমন শিউরে উঠল। আর সবচে' অদ্ভুত লাগল এই কথা শুনে যে এ বাড়ীর মেয়েরা অনেকে লেখাপড়াও শিখেছে, তবু এই বৃত্তি ছাড়েনি। প্রথম যেদিন এদের কেউ কোনো পুরুষের কাছে নিবেদিত হয়, সেদিন এদের মহোৎসব। এবং তখন সেই মেয়ের যে কর্ত্রী সে একটি মোটা টাকা পায়। এই বাড়ীর একটি মেয়ে একবার ৬০,০০০ টাকায় বিক্রি হয়েছিল এক ধনী ব্যক্তির কাছে। প্রধানতঃ সেই টাকাতেই এই তিনতলা বাড়ীটি তৈরী হয়। এটি এদের প্রধান সম্পত্তি।

আমরা নিচুস্বরে এসব কথাবার্ত্তা বলছি এবং ততক্ষণে আমি এও শুনেছি যে শান্তাবাঈ-এর বোন কুসুমবাঈ এখন প্রধান গায়িকা, অসাধারণ গান করেন। তখনই ৬/ ৭ জন মহিলা/মেয়ে ঘরে ঢুকলেন।

তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল যিনি, খুব শান্ত, ব্যক্তিত্বময়ী, বছর পঞ্চান্ন বয়সের এক মহিলা— ইনিই কুসুমবাঈ। কাছা দিয়ে মারাঠী ধরণে কাপড় পরা। উনি ঢুকতেই আমি উঠে গিয়ে ওঁর হাত ধ'রে নিচু হ'য়ে নমস্কার জানালাম।

আমার মনে হ'লো ভদ্রমহিলা (ভদ্রমহিলাই বলছি, কারণ আচারে ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় আপ্যায়নে এঁদের ভদ্রতার তুলনা নেই।) এই সম্মান জানানোতে

আপ্লুত হলেন। জড়িয়ে ধ'রে মাথায় হাত বোলালেন।
একটু পরে এলেন শান্তাবাঈ। তিনি আরও একটু প্রৌঢ়া, চোখে চশমা, শহুরে ধরণে সাদা শাড়ী পরা, মাথায় ঘোমটা। তাঁরও বেশ ব্যক্তিত্ব আছে। তিনি বেশিক্ষণ বসলেন না। তাড়াতাড়িই চ'লে গেলেন। তারই মধ্যে আমাদের জন্য লস্যি এল। সামনে ব'সে একটি মেয়ে জাঁতিতে সুপুরি কেটে আমাদের সামনে ধ'রল। পরে বুঝেছিলাম এটি এঁদের আপ্যায়নের রেওয়াজ। যে মেয়েরা আমাদের সামনে বসেছিল তাদের সাজসজ্জার দিকে নজর দিলাম। এদের পোশাক একটু অন্য ধরণের। মানে ঐ অঞ্চলের সাধারণ ঘরের মেয়েরা ঠিক এই ধরণে সাজবে না। এদের মধ্যে একজন ছিল যার বিয়ে হ'য়েছে। তখন মনে হ'য়েছিল কলকাতার আগন্তুক ব'লে এই সাজ (যদিও কলকাতা ঠিক কোথায় এ সম্পর্কে এ অঞ্চলের লোকের খুব স্পষ্ট ধারণা নেই)। পরে বুঝতে পারি, ওদের মেহ্‌ফিল শুরু হয় রাত ৮টা নাগাদ। তখন তো লোকজন এসে পড়বে তাই একেবারে প্রস্তুত হ'য়ে আসা। গায়ে গয়না, বেশির ভাগেরই নাইলন শাড়ী। ব্যতিক্রম শান্তাবাঈ এবং কুসুমবাঈ। কুসুমবাঈ-এর পরনে মারাঠী রঙীন শাড়ী মারাঠী ঢঙে পরা। চেহারা একটু ভারী। এঁরা খুবই লাজুক, বিশেষ কথা বলতে চান না— তার ওপর হিন্দী বিশেষ জানেনই না, সেজন্যও আড়ষ্টতা। তাছাড়া বোধহয় আমার মত কলকাতাবাসী নাট্য-শিল্পের সঙ্গে যুক্ত এক মেয়ের কথা শুনে আড়ষ্ট ছিলেন ওঁরা। পরে মনে হ'ল ওঁদের ধারণা হ'য়ে গেছে (হয়তো আমার চশমা দেখে ; ওখানে খুব বেশী লোকের চশমা নেই, অল্পবয়সীদের তো নয়ই।) যে আমি খুব লেখাপড়া করেছি। সেজন্যেও হ'তে পারে।

শোনা গেল ওঁরা যে ধরণের নাচগান করেন তার একটাকে বলে 'লাওনি'। আর যেটা প্রধান সেটা 'বৈঠকী চিলাওনি'। এজন্যই এই বাড়ীর খ্যাতি। এই ধারাগুলোর প্রধান রস শৃঙ্গার। বিষয়বস্তু সবসময়ই 'প্রেম'। তার প্রকাশ গানে, ভাও-এ।

এর পরের পরের দিন সকালে আবার আমরা হাজির হ'লাম শান্তাবাঈ-এর কোঠিতে। এখানে তখন অনেক কোঠির মেয়ে জড়ো হ'য়েছে। এদের নাচ-গান শেখান শেখ হারুণ উরফিরোঁ। এঁর কাছে মেয়েরা যথার্থ গনিকা হবার জন্যে প্রস্তুত হয়। যে যত ভালো গান বা নাচ জানবে সে প্রথমবার তত চড়া দামে বিকোবে।
এই শেখ হারুণ মাঝবয়সী এক ব্যক্তি—অত্যন্ত ভদ্র, বিনয়ী। কলকাতার থেকে একজন মেয়ে এঁদের সম্পর্কে জানবার জন্যে, এঁদের 'কলা' দেখবার জন্য এসেছে, এতে ইনি যেন কৃতার্থ। কি ক'রে সম্মান জানাবেন ভেবে পাচ্ছেন না।
সেদিন দেখা পেলাম কুসুমবাঈ-এর এক ভাই-এর। সে তবলায় সঙ্গত করে। সেদিন একটা পুরোণো ধরণের অর্গ্যান আনা হ'য়েছে ঐ ঘরে। কিছু ঘুঙুর জড়ো ক'রে রাখা হ'য়েছে হাতে বাজাবার জন্য।

অনেক অল্পবয়সী মেয়ে দেখলাম সেদিন—১৪/ ১৫ এইরকম বয়স। এদের মধ্যে একটি সুন্দর নিষ্পাপ মুখের মেয়ে এসে দাঁড়াল। সে নাচবে। 'লাওনি' অর্থাৎ শৃঙ্গারপ্রধান গানের সঙ্গে নাচ। মেয়েটির নাম বন্দনা। সে প্রদীপ জ্বালল। দাঁড়ওয়ালা ছ-মুখো তিনটি দীপ জ্বালানো হ'লো। একটি সে মাথার ওপরে রাখল, দু'হাতে দুটি। শেখ হারুণ হিন্দী বলেন। এঁর কাছে শুনলাম বন্দনা তাঁর খুব উজ্জ্বল ছাত্রী। ঐ দীপ নিয়ে মেয়েটি নাচল। গান গাইছিলেন শেখ হারুণ অর্গ্যান বাজিয়ে। গলায় একটা বিশেষ ভাব আছে—একটা বিষণ্ণতাও। বিষণ্ণতা আছে গানের মধ্যেও, গানের সুরেও। ঢিমে লয়ে গানটি চ'লছিল—"নাচে রহে কোই আজ রে/ নাচে রহে কোই আজ।" মেয়েটি দীপসহ নাচতে থাকল। নাচতে নাচতে ব'সল, উপুড় হ'য়ে শুলো। ঠিক নাচ শেষ করবার মুহূর্তে বেচারীর মাথা থেকে দীপটি প'ড়ে গেল। খুব লজ্জা পেল সে, যেন অপরাধ করেছে।
এরপর কুসুমবাঈ গান করলেন, ঠুংরীর মত ভাও দেখিয়ে। এঁরটাই নাকি হ'লো বৈঠকী চলাওল বা চিলাওনি। দু-রকমই বলতে শুনেছি। এঁর বসার একটা ধরণ আছে, ঘোমটা বা আঁচল ব্যবহারের একটা রীতি আছে। এঁর গান শুনে আমি মুগ্ধ। এঁর অভিব্যক্তি প্রকাশেরও একটা বিশেষ ধরণ আছে। আর কি গলা! গলায় যেন জাদু আছে! যদি আমার অনেক টাকা থাকত তাহলে আমি এঁর রেকর্ড বার করতাম। এঁকে আরও একটু গাইতে বললাম।

হ্যাঁ, বলতে ভুলেছি—এই সকালে যখন এরা নাচগান দেখাবে ব'লে প্রস্তুত হ'য়েছে তখন কিন্তু এদের কারও মুখেই রূপচর্চার চিহ্ন নেই। ভালো শাড়িও পরেনি। কুসুমবাঈকে গান গাইতে অনুরোধ করবার পর সবাই তাঁকে ধ'রে বলল নাচতে হবে। কুসুমবাঈ লজ্জা পেলেন। কিন্তু সবাই অনুরোধ করতে উনি উঠে গিয়ে একটা জামরঙের জরিপাড় মারাঠী শাড়ী কাছা দিয়ে প'রে এলেন। তারপর খুব সামান্য ভঙ্গি ক'রে গান গাইতে গাইতে নাচলেন—ঘুঙুর না প'রেই। এঁর গানের ভাষা মারাঠী।—আমার পক্ষে এটা একটা অভিজ্ঞতা।

পরে আবার নাচল বন্দনা এবং অনীতা। আর একটি মেয়ে নাচল—মুন্নি—হিন্দী ফিল্মের অনুকরণে।
কিন্তু কুসুমবাঈ এঁদের সবার থেকে আলাদা। তাই শেষকালে আবার ওঁকে গাইতে অনুরোধ করলাম। গাইলেন। আসর শেষ হ'লো।

বেলা হ'য়েছে। তখনও আমার আরও দু-দুটো লোককলার আঙ্গিক দেখা বাকি। তারই মাঝে কিছু খেয়েও নিতে হবে। শুনলাম—ওখানে প্রায় তিনশ' কোঠিবাড়ী আছে। এই বাড়ীটি শান্তাবাঈ-এর নিজস্ব কোঠি। বাকিরা ভাড়া নিয়েছে। এক একজন বাঈ-এর নাম জোহ্‌রাবাঈ, চন্দ্রকলাবাঈ, শকুন্তলাবাঈ। এঁদের সব বয়স হয়েছে। এঁরা এখন মালকান। এঁরা সবাই এবং আরও অন্ততঃ ত্রিশ জন আমায় দুপুরে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ঢেড়ে সাহেব বোধহয় ভেবেছেন কার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ নিলে কে চটবে—কাজেই

কারও নিমন্ত্রণই নেননি। সেদিনই আমার পুণে রওনা হবার কথা। একাধিক নিমন্ত্রণ নেওয়া অসম্ভব!
ঢেড়েজী বললেন চন্দ্রকলাবাঈ অনেক ক'রে বলেছেন, একবার যেতেই হবে তাঁর ওখানে। যাওয়া হ'লো সেখানে। তখন ওখানকার চেহারাটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। যে মেয়েটি দীপ নিয়ে নাচছিল, বন্দনা, সে এই কোঠির। এরা আবার লস্যি দিল, সুপুরি দিল—মালা পরিয়ে নমস্কার করল। আর যখন চ'লে আসছি চন্দ্রকলাবাঈ (ইনি একটু হিন্দী বলতে পারেন) জোড়হাতে বললেন,—
—"আমরা তামাশা-আর্টিস্ট। ('তামাশা' মহারাষ্ট্রে 'যাত্রা'রই মত জনপ্রিয় ছিল) এখন তামাশা আর কেউ দেখে না। সব জায়গায় ভিডিও-তে সিনেমা দেখে। পেট আমাদের চ'লে যায়। কিন্তু আমাদের 'কলা': তার কি হবে? আপনি লেখাপড়াজানা মানুষ। আপনি আমাদের এই শিল্পের জন্যে কিছু করতে পারেন না? আপনি লিখবেন?"

আমার চোখে প্রায় জল এসে গেল। আমি কী করতে পারি? কতটুকু ক্ষমতা আমার! আমি যে কিচ্ছু ন'ই সেটা চন্দ্রকলাবাঈকে বোঝাই কেমন ক'রে? তাই প্রায় কোনো উত্তর না দিয়ে কেবল নিচু হ'য়ে নমস্কার ক'রে বেরিয়ে এলাম।

টেপে তুলে আনা ওদের গানগুলো শুনি। ওদের মুখগুলো মনে পড়ে। মনে পড়ে ওদের শেষ অনুরোধ। বারে বারেই একটা ধাক্কা খাওয়ার মত অনুভব হয়।

এ কাহিনীর উপসংহারটুকু বলি। সেটি আমার কাছে একটা ট্র্যাজিক রূপ নিয়ে এসেছিল। কি কষ্ট হ'য়েছিল! আজও হয়।

আমাকে যে লজটায় তুলেছিলেন সুরেশ চিখ্‌লে—তাতে আমার পাশের ঘরে থাকতেন শ্রীচিখ্‌লে। সেখানে রামকৃষ্ণ ঢেড়ে এবং অপর একটি লম্বা সুদর্শন যুবক আসতেন। তাঁরা গল্পগাছা করতেন হয়তো। খুব ছোট্ট, স্বাচ্ছন্দ্য বিহীন, প্রায় অস্বাস্থ্যকর একটি লজ। যতটুকু সময় ঘরে থাকতাম নোট নেওয়া, টেপ শোনা ইত্যাদি নানান কাজে ব্যস্ত থাকতাম আমি। অন্য কোনো দিকে মন দেবার অবসরই থাকত না। একদিন শ্রীঢেড়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল। সদ্যবিবাহিত ভদ্রলোক। তাঁর নতুন বৌ, আমি, সুরেশ চিখলে আর কিছু পরে এল ঐ যুবকটি। কেউ প্রত্যক্ষ আলাপ করিয়ে দিল না। অপ্রশস্ত গরম একটি ঘরে কোনোরকমে খাওয়া। আমিও অত আগ্রহী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করিনি—এ ছেলেটি কে!
যেদিন চ'লে আসছি বাসস্টপে বহু মানুষের ভীড়। যেসব লোকশিল্পীর সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল প্রায় সবাই উপস্থিত। কেউ হাতব্যাগটুকুও বইতে দিচ্ছে না। এত ভালোবাসা পেয়ে আমি তখন অভিভূত।
তখন ভীড়ের মধ্যে হঠাৎ দেখি সেই যুবকটি। পরিষ্কার হিন্দীতে বললে,

—দিদি আপনি তো সর্বসময়ে দেখেছি লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। গল্প করবার অবসর ছিল না। এবারে ছুটিতে আসুন। আমরা ঘুরব ফিরব, গপ্পো করব।
আমিও বললাম—
হ্যাঁ-হ্যাঁ সে বেশ হবে!
দুজনেই জানি এমনটি ঘ'টে ওঠা অসম্ভব।

এই কথাটিতে আমার ছেলেটি সম্পর্কে কৌতূহল হ'লো, বাসে ওঠা পর্যন্ত সকলের সঙ্গে সে-ও ছিল। সব গ্রামের শিল্পীরা আমার জন্য ফুল লুকিয়ে রেখেছিলেন অতক্ষণ। বাস ছাড়বার মুখে জানালা দিয়ে ফুল দিলেন। সেখানে ১০ বছরের শিশু থেকে ৮০/ ৯০ বছরের বৃদ্ধও ছিলেন।

বাস ছেড়ে দিল। আমি আপ্লুত।

হঠাৎ ঐ ছেলেটির কথা মনে হ'তে শ্রী চিখ্‌লেকে জিজ্ঞাসা করি—
—ঐ ছেলেটি কে? যে আপনার ঘরে আসত, এতক্ষণ বাসডিপোতে দাঁড়িয়েছিল? সুরেশ চিখ্‌লে বললে,—
—সুরেশ!
একই নাম ব'লে আমার ঠিক ঠাহর হ'লো না।
বললাম, 'কে?'
বললে, 'সুরেশ!'
আমি বললাম, 'সুরেশ কি? ওর পদবী কি?'
সুরেশ চিখ্‌লে এমন ভাব করলেন যেন আমি বড্ডই মাথামোটা। বললেন, 'দিদি, উও হী হ্যায় কুসুমবাঈকা লড়কা, জো স্টেটট্রান্সপোর্ট মে কাম করতা হ্যায়। আপনে সমঝা নহী?'

শুনলাম ছেলেটি অন্যরকম ভাবে বাঁচতে চায়। কিন্তু তার শরীরে দাগ—সে বিখ্যাত কুসুমবাঈ-এর ছেলে। কারো সঙ্গে সে মিশতে পারে না ঐ ঢেড়ে ছাড়া। রাত ২॥টে নাগাদ বাড়ীতে ঢুকে চিলেকোঠায় নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। আর সকাল বেলায় উঠে বেরিয়ে পড়ে। সারা সময়টা তার কেমন ক'রে কাটে?

জানি না এতদিনে পরবনী ছেড়ে সে অন্য কোথাও স্থিতু হ'য়েছে কি না। কিন্তু আজও সেই সুরেশের সুন্দর অথচ বিষণ্ণ চেহারা আমাকে কষ্ট দেয়। মনে হয়— আহা দু'টি কথা বললুম না কেন! সে হয়তো ভেবেছে তার ঐ পরিচিতির জন্যই আমি মিশতে চাইনি!
আর তো শোধরাবার পথ নেই। কিন্তু কোঠিবাড়ীর কথা বলতে গেলে 'সুরেশ'কে বাদ দিয়ে ও কাহিনী বর্ণনা করা খুব শক্ত। খু-উ-ব।

তিজনবাই

জাতীয় নাট্যমেলায় একজন কলাকারকে দেখে কলকাতার দর্শক মুগ্ধ হয়েছেনই—এবং এ নিয়ে প্রায় কোনো বিতর্ক নেই—ইনি হ'চ্ছেন মধ্যপ্রদেশের পুনারামজী।
বিজ্ঞাপন দেখে মানুষের একটু ভ্রম জন্মাতে পারে যে, আমরা যেরকম নাটক দেখতে অভ্যস্ত এ বুঝি সেইরকমই নাটক। কিন্তু তা নয়।
এই ধরণটাকে ওখানে বলা হয় 'পাণ্ডোয়ানি'। এক ধরণের কথকতা। আমি যখন আমার নাটক নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম তখনই আমি শুনেছিলাম—এরকম কথকতা অনেক ধরণে ভারতবর্ষে ছ'ড়িয়ে আছে।

মধ্যপ্রদেশেব ছত্তিসগড় অঞ্চল সংস্কৃতির মণিমাণিক্যে ভরপুর। ওখানে অনেক ধরণের performing art রয়েছে, অনেক গুণী শিল্পী আছেন, যাঁরা হয়তো কৃষক অথবা শ্রমিক কিন্তু নিজেদের এই শিল্পের কাজকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন। এই পুনারামজীই ধরুন, তাঁর উপজীবিকা ছিল কৃষি। তাঁর বাবা ভজন গাইতেন, তাই শুনে তিনিও গাইতেন, হঠাৎ একদিন ঝাড়ুরামজীর পাণ্ডোয়ানি দেখে মনে মনে তাঁকে গুরু হিসাবে বরণ করেন, এবং এই শিল্পকলাকে আপন কর্ম হিসাবে গ্রহণ করেন। ঝাড়ুরামজী বয়োঃজ্যেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম শিল্পী ব'লে মধ্যপ্রদেশ সরকারের কাছে 'শিখর সম্মান' পেয়েছেন। ঝাড়ুরামজীর গ্রামের বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম। সে অবশ্য ভিন্ন প্রসঙ্গ।

আমার মনে সবচেয়ে দাগ কেটেছে কিন্তু তিজনবাই। তিজনবাই-এর নাম আমি কলকাতায় ব'সে শুনেছি শ্রী হবিব তনবীরের কাছে। আমার নাটক দেখার পর ওঁর তিজনবাই-এর কথা মনে হ'য়েছিল। তাই শো-এর পরে ভেতরে এসে বলেছিলেন। তারপর সংগীত-নাটক-একাডেমির একটা কাগজে তিজনবাই-এর ছবি দেখলাম, ওঁর সম্পর্কে কিছু পড়লাম। তখনই মনে মনে ঠিক করেছি তিজনবাই-এর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। ভোপালে চিঠি লিখলাম। উত্তর এল—ভোপালে একটা লোকনাট্য-উৎসব হ'চ্ছে, তাতে তিজনবাই আসবে। এপ্রিলে। আমি তো পুলকিত। ঐ সময়কার অন্য সব কাজকম্মো কিছু বাতিল ক'রে, কিছু এদিক ওদিক ক'রে ঐ সময়টাতে

মধ্যপ্রদেশে যাবই ব'লে তৈরী হ'লাম। দিন পাঁচ-ছয় আগে তার এল—নাট্যোৎসব হ'চ্ছে না। আমিও তার পাঠালুম, আমি ঐ সময় যাচ্ছিই। গিয়ে যা ঠিক করা যায় কারণ আমাকে দেখতেই হবে যেমন ক'রে হ'ক।

তিজনবাই-এর জন্য অবশেষে রায়পুরে পাড়ি দিতে হ'লো, ভোপাল থেকে। রায়পুরে তখন ৪২° সেলসিয়াস। তারই মধ্যে খাওয়া দাওয়া ক'রে ৩ টে নাগাদ রওনা হ'লাম তিজনবাই-এর গ্রাম গনেয়ারীর উদ্দেশে। আমি, আমার স্বামী এবং মধ্যপ্রদেশ কলাপরিষদের একটি ছেলে নওল। ঐ ৩ টে নাগাদই দেখেছি ওখানে গরমটা অত্যন্ত বাড়ে। ১২ টা/ ১টায় অত অসহ্য লাগে না। গাড়ি তেতে পুড়ে গরম। রায়পুর থেকে ভিলাই পৌঁছে, ভিলাই পেরিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা ধ'রে অবশেষে সেই গ্রামে পৌঁছোনো গেল। গনেয়ারী। গাড়ি থামিয়ে তারপর হাঁটা রাস্তা। নালা, ছোট ছোট জল জমা মাঠ পেরিয়ে আল ধ'রে হেঁটে হেঁটে অবশেষে পৌঁছানো গেল তিজনবাই-এর বাড়িতে।

ও! বলতে ভুলেছি! ভোপালে দুদিন সরকারী দপ্তরে ভিডিওতে তিজনবাই-এর অভিনয় দেখে আমরা তখন ওঁর সঙ্গে মেলবার জন্য ছটফট করছি।

একটু ব'লে নিই পান্ডোয়ানিটা কি! 'পান্ডোয়ানি' নাম হ'য়েছে কারণ ওরা পাণ্ডবদেব গল্প বলে। ওরা পুরো মহাভারতের কাহিনীই বলে। সেটাই ওদের রীতি। আঠারো পর্ব আঠারো দিনেও শেষ হয় না—যদি দিনে ৩/ ৪ ঘন্টা ক'রেও বলে তবুও না—এটা ওঁদের অভিজ্ঞতা। ওঁদের মানে, যে তিনজনের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে কথা হ'য়েছে। তিজনবাই, ঝাড়ুরাম, পুনারাম—এই তিন শিল্পী।
ওঁরা বলেন, 'আজকাল তো অত কেউ শুনতে চায় না! যে যেমন শুনতে চায় আমরা তেমন শোনাই।' তিজনবাইকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি আমাদের জন্য কতক্ষণ করবে?'
ও উত্তর করলে, 'আপ চাহে তো দস্ মিনট,—আপ চাহে তো তিন ঘন্টে।'
খুবই বুদ্ধিমতী এবং রসিকতাবোধসম্পন্ন মহিলা। মহিলার বয়স কত হবে? ৪০ থেকে ৪৫-এর মধ্যে। ইনি এবারে ভারত-উৎসবে প্যারিসে গেছেন। তখনই শুনেছিলাম জুন মাসে যাবার কথা। তারপর তো শুনলাম উৎসব উদ্বোধনের যে অংশ দূরদর্শনে দেখানো হ'য়েছে তাতে সারা ভারতবর্ষ দেখেছে তিজনবাই অভিনয় করছে। তারপর শুনেছি তিজনবাই প্যারিস জয় করেছে! দিল্লীর কাগজে এ নিয়ে লেখা বেরিয়েছে। কি গর্ব যে হ'লো!

মাঠ পেরিয়ে, ঘাট পেরিয়ে তিজনবাই-এর বাড়িতে পৌঁছে ডাকাডাকি

হ'লো। মাটির পাঁচিল—ছোট দরজা—ঢুকেই মাটির উঠোন—পাশে নিচু দাওয়া, তার গায়ে দুটো ঘর। একটু ডাকাডাকির পরে একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল তিজনবাই। গরমের দুপুরে ক্লান্তির ঘুম ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। শুকনো চেহারা, সাদা শাড়ি-পরা সামনে আঁচল দিয়ে। এই কি সেই ভিডিওতে দেখা তিজনবাই ? আমি যেন চিনতে পারছি না !

ক্রমশঃ ভাব হ'লো তিজনবাই-এর সঙ্গে। ততক্ষণে অনেক লোকও জুটে গেছে গ্রামের। কারা সব এসেছে তিজনবাই-এর বাড়িতে। তিজনবাই-এর পক্ষে এটা খুব নতুন নয়। তার পরের সপ্তাহেই আবার ওকে দাঁড়াতে হবে ফরাসী টেলিভিসনের লোকজনের সামনে। ফ্রান্সে ভারত-উৎসবের প্রাক্কালে আমরা গিয়েছিলুম তিজনবাই-এর বাড়ীতে।

তিজনবাইকে জিজ্ঞাসা করলাম আর কোনো মহিলা কি পাণ্ডোয়ানি করে ?
—না।
—আগে কেউ কখনো করেছে ?
—না।
—তবে আপনার এটা মনে হ'লো কি ক'রে যে আপনি করবেন ? কেন মনে হ'লো ? এরকম কোনো দৃষ্টান্ত তো ছিল না !
তিজনবাই বললে,
—সে অনেক লম্বী কহানী মা ! ফির আপ শুন্‌না চাহ্‌তে হেঁ তো সুনা দেতে, ছুপানেকা কোই বাত নহী।

এরপর তিজনবাই ছত্তিসগড়িতে বলতে শুরু করে তার জীবনকাহিনী।
—বড় দুঃখের জীবন ছিল মা আমার। পেট ভ'রে খাওয়া জুটত না। খুব কষ্ট করতে হ'তো। খাটতে হ'তো। ক্ষেতে যাও, কাম করো, ভারি বোঝা উঠিয়ে নিয়ে এসো। ধান কোটো, চাল করো—তবে খাও। ছোট ঝোপড়িতে থাকতাম। স্বামীর পছন্দ ছিল না আমায়। লোকে এসে বলতো- 'তোর আদমী লা তোলা ছোড় দে হে। ইয় ম তোলা ঝোপড়ি ন রহন দেওয়ে।' —নই রহন দোও তো নিকাল দো। ম্যায় কহুঁ—নিকাল দোও ! তো লোকে বললে— 'এ্যায়সান মত নহী নিকলে তো ঝোপড়িমে আগ লগা দেবে।' ম্যায় কহুঁ— লগা দোও। এইরকম ঝগড়াঝাঁটি চলে আর সারাদিন কাজ আর কাজ আর কাজ। ক্ষেতে কাজ করা, বোঝা বওয়া, ধান কোটা, ঠাকুর বাড়ীতে (অর্থাৎ অবস্থাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বাড়ীতে) কাজ করতে যাওয়া, জল আনা, রাঁধা-বাড়া খাওয়ানো। দিন চলতেই থাকে।

দিন চলতেই থাকে এইভাবে তিজনবাই-এর।

—ফির দুসরা মন সোচে কি ইয়ে নারী, ইয়ে বাই ক্যাইসে ইসনে রহ্ যায় ! মাটি

বওয়া, এই কাজ, ঐ কাজ—এইভাবে আমার জীবন চলবে না। আমি চাটাই বুনেও রোজগার করতাম কিছু। একদিন চাটাই বোনার জন্য খড়বিচুলি আনতে বড় ভারি বোঝা হয়েছে। তা একজন ছাগল চরাচ্ছিল, তাকে আমি বললাম—আমার বোঝাটা একটু উঠিয়ে দেবে?— সে দিল। অর্ধেক পথ এসে আমি হাঁপিয়ে গিয়েছি, আর পারছি না। বোঝা ফেলেছি। —এবারে কে আমার বোঝা উঠিয়ে দেবে? কেউ কোনোদিকে নেই। মনে ভাবছি—ভাবছি—এখানে তো কোনো পুরুষ নেই। এত ওজনের বোঝা কে আমার মাথায় উঠিয়ে দেবে! হঠাৎ দেখি এক বুড়ি। যেন একটা সুন্দর হাঁড়ি তার পাশে। দেখে মনে হ'চ্ছে—কোই মছলি পকড়ত হ্যায়।

—ক্যায় পকড়ত হস মা?

—মছলি পকড়ত হো!

—আচ্ছা!— এ বোঝে মোলা সরপে উঁঠা দে!

—বেটি, ম্যায় উঠা ন নহী সকুঁ।

(ছত্তিসগড়ী ভাষা এত মিষ্টি মাঝে মাঝে উদ্ধৃতি দেওয়ার লোভ সামলানো শক্ত।)

—বুড়ি—মা! একেবারে বুড়ি! ভীষণ বুড়ি! তা আমি বুড়িকে বললাম—

—মা, এই এত বড় বোঝা, এ আমি কেমন ক'রে বইব?

বুড়ি বললে— তয় বহলে!

তো বোলে—কেইসে বহ লুঁ!

বুড়ি বললে— তয় বহ লে বেটি! এ তো সোজা! এই কথায় কথায় ঐ বোঝা উঠিয়েছি—আর মা বলব কি—মনে হ'চ্ছে ঐ বোঝা—সচমচ দো-চার কিলো কি! আমি উঠিয়ে অনায়াসে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। দেখো—অত বড় বোঝা আমার হাল্কা লাগল কি ক'রে? কি ক'রে? নিশ্চয়ই কোনো আত্মা মানুষের দুঃখ দেখে উদয় হ'য়েছিলেন। তাকে তো আমি আগে কখনো দেখিনি! এই ভাবতে ভাবতে তো ঘরে পৌঁছিয়েছি। তার আটদিন বাদে মা—ঘরে আমি যেন চাষবাসেরই কাজ করছি। ওই বুড়িয়া মা পৌঁছে গেছে আমার আঙনে। মোলা চিল্লাত 'তিজনবাই-তিজনবাই।' আমি বলি— কই?

—বেরিয়ে তো এসেছি,আমার ছোট ঝোপড়ি থেকে। বলি,—

—বৈঠলে।

—আমি বসবার জন্যে আসিনি বেটি। তোমায় একটা কাজ করাতে এসেছি।

—কি কাজ? কয়েদিন আমি কোনো কাজ করতে পারিনি, কাজ ছুটে গেছে।

—না, না। সেরকম কোনো কাজ নয়। এ কাজ পারবি বেটি।

তো উঠে আমার দেওয়ালের দিকে দেখিয়ে বুড়ি বললে, —'ওটা কি রে?'

ঘুরে দেখে আমি ব'লি, 'ও তো বীণা, তম্বুরা। সে তিনতারওলা মা, এত্ত বড়ো।

তিজনবাই আমাকে হাত দিয়ে দেখায়।

বুড়ি বলে,
—ঐ কাজ।
—মা, ও তো জীবনে আমি কখনো বাজাইনি।
—ও তোর বাজাতে বাজাতে হবে।
—না, আমি পারবো না মা।
তারপর আমি তম্বুরার দিকে চেয়ে ফের ঘুরে দেখি বুড়ি নেই। চ'লে গেছে। আমি বলি—একি স্বপ্ন! আমার ঘুম ভেঙে গেল মা। আমি চেঁচিয়ে উঠেছি। আমার তখন ভয় করছে। আমার স্বামী বললে, 'কি হয়েছে?' আমি বলি 'বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি।' বললে,— 'তুই শুয়ে পড়, ও কিছু না।'

সেই থেকে মা, আমার মাথায় ঐ কথা ঘুরতেই লাগল! 'তম্বুরা! তম্বুরা! ঐ কাজ আমি কি ক'রে করব?' তো একদিন রাতে পুকুরপাড়ে যাচ্ছি। তা আমার 'বাবা' মানে নানা হ'তো (মনে হ'লো কথায় গ্রাম সম্পর্কে।) —বাবা বলতাম—এখন মারা গেছেন—তিনি তম্বুরা বাজাচ্ছিলেন। তিনি ভজন গাইতেন। এমনি, বাড়িতে, মনোরঞ্জনের জন্য। ('মনোরঞ্জন' শব্দটি তিজনবাই-ই ব্যবহার করেছিল।) কোথাও যেতেন না। এক হাতে করতাল বাজাতেন যেমন ঝাড়ুরাম বাজান তেমনি। আর এক হাতে তম্বুরা টুং টুং বাজান। আমি লোটা নামিয়ে মা ওখানে পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে গেছি। ওই 'কথা' শুনে আমার এত আনন্দ হ'তে লাগল মনে যে আমি ঐখানেই ব'সে শুনতে শুরু করেছি। যখন ঐ গানের পালা শেষ ক'রে ওরা শুয়ে পড়েছে তখন যেন আমি উঠতে পারলাম। উঠে কোনোরকমে জল আনতে গেলাম। তা অনেক রাত হ'য়ে গেছে তখন। আর মাথায় তখন কেবল ঐ তম্বুরা বাজানো. ঐ গান, ঐ কথা ঘুরছে। ঘুরছে। তারপর থেকে রোজই আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ঐ 'বাবা'-র গান শুনি। একদিন বাবা বললে—'কে রে ওখানে?'
—তিজনবাই বাবা।
—কখন থেকে শুনছিস?
—আজ পনেরো দিন হ'য়ে গেছে বাবা!
—পনেরো দিন! তা আয় ভেতরে আয় বেটি।
—বাবা, আমায় তম্বুরা বাজানো শেখাবে?
—কেন শেখাবো না? শিখ—আভি শিখ্।
—আমি তো একদম পারি না বাবা।
—আরে আমিও তো মার খেয়ে শিখেছি।
আমি শিখতে থাকি! ওখানে যিনি খঞ্জনী বাজাতে এসেছেন—একদিন তাঁকে ব'লি, 'খঞ্জনী বাজাবেন?' বলেন, 'হ্যাঁ।' আমি তম্বুরা বাজাই, উনি খঞ্জনী বাজান। বাজাতে থাকি, গান গাই।

কিছুদিন এরকম যাবার পরই বাড়িতে ঝগড়া শুরু হ'য়ে গেলো। আমার স্বামী আমায় মারল, গালি দিল। এইরকম প্রায় রোজই মারপিট চলে, রোজই

চলে। তো একদিন ঝগড়ার মধ্যে আমি বলেছি—'তম্বুরা ছোড়কে আহুঁ! মোলা কাটলে ভি কোই পরোয়া নহী। আওর তম্বুরা ধরে রহুঁ তো মোলা 'সালে' নাম কি শব্দ নহী দেখনা।' তম্বুরা ধ'রেই চীৎকার ক'রে এই কথা বলেছি মা! তম্বুরা ধ'রে এই বিশ্বাসে যখন এই কথা বলেছি তখন উও মারিস এক ঝাপড়। তো মারিস ঝাপড় তো ম্যায় গির গিয়ে হুঁ। তারপর গালি দেওয়া শুরু ক'রল মা। তো আমি বলি 'আচ্ছা!' তো আমি চুপ ক'রে উঠে আঙনে খাটিয়া বিছিয়ে শুয়েছি। ভাবি আজ কোথায় যাব? কোথায় যাই? তম্বুরা ছেড়ে তো থাকতে পারব না। তা একজনকে গিয়ে বললাম, সে বললে, 'চল, আমি নিয়ে যাচ্ছি।' তো বর্তনটর্তন কাপড়জামা নিয়ে ঘর করব না মনে ক'রে পালালাম। তারপর এ গাঁয়ে বাস, ঝোপড়ি বেঁধে।

ব'লে রাখি তিজনবাই-এর তিনটি সন্তান। ছোটটি দশ বছরের। সে যখন কোলে তখন তিজনবাই ঘর ছেড়ে আসে। তিজনবাই-এর বড় আশা এ একদিন কলাকার হবে। বড় ছেলেটির বিয়ে দিয়েছিল এই আশায় যে বউ এখন ঘরের কাজ সামলিয়ে নেবে। কিন্তু বউ বেচারী রুগ্না। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন সে খুব জ্বরে ভুগছিল। তিজনবাই-এর এখন মাটির বাড়ি হ'লেও একটু আঙনওলা, বোধহয় তিনটে ঘরওলা একটা বাড়ি। একটা ছোটো ক্ষেত ক'রেছে, তাতে চাষ হয়।

—কে চাষ করে?

—আমিই ক'রি মা। কে করবে। ছেলে সাহায্য করে।

—এখানে তো ঝোপড়ি বাঁধলে। তারপর কি হ'লো?

—ক্রমশঃ র'টে গেল ভালো ভজন গাই। তা কোতোয়াল চালডাল পৌঁছে দিলে ঘরে। তারপর বাজনদার জুটে গেল। চাচা উমনসিং ব'লে একজন, সে খুব ভালোবাসত আমার কথা আর গান শুনতে। তা একদিন তিনি বললেন,—

—'তুই ঠিক গাস না, আধা গাস।'

—তা আমি বলি,—

—বাবা, আভি মোলা কোই শিখওয়া দিজিত তো ম্যায় শিখ জাঁউ।

তো বললেন, 'আচ্ছা আমি শেখাব।'

তা আমি বললাম, 'ঠিক আছে। আমি আপনাকে গুরু মানলাম।'

তারপর ওঁর কাছে মহাভারতের কাহিনী পুরো শিখে এখন আমার এই অবস্থা হ'য়েছে, এইভাবেই চলে।

এই অবস্থা মানে তিজনবাই-এর এখন ভীষণ নাম। সে 'রেডিও সিংগার'। তাকে ভোপালেও যেতে হয়। অনেক জায়গা থেকেই ডাক পড়ে। দিল্লীতে গিয়ে সংগীত নাটক একাডেমির নাট্যোৎসবে অভিনয় ক'রে এসেছে। তিজনবাই কিন্তু না জানে পড়তে, না জানে লিখতে। ও যে পুরো মহাভারতের কাহিনী বলে সবই শুনে শুনে মুখস্থ। আর কি গলার ওঠা নামা! কি অভিব্যক্তি! আমরা ব'লি—দিল্লী তো আপ গয়ে! বোম্বাই? —নহী বাবা।

—কলকাতা ? —নহী বাবা। কন লে জানেওলা মুঝে কলকাত্তা !

এবার 'কথা' শুরু হবে। কথকতা। মলিনবেশী তিজনবাই ভাবে একটু সেজে এসে দাঁড়াবে। রুক্ষ চুল, সাদা শাড়ি, আভরণহীন শরীর নিয়ে তিজনবাই সাজতে যায়। তখন এক থুনথুনে বুড়ি আসে। সেও কোনো সময়ে গান গাইত। তাকে অনেক অনুরোধ করা হয় গাইতে। বুড়ি বলে, 'বাবারা আমার কিছু মনে নেই। আমার বয়স অনেক। আমি কড়িতে কেনাবেচা দেখেছি। আমি কি আজকের লোক ?'
সে তিজনবাইকে অসম্ভব ভালোবাসে। তিজনবাই-এর কাছে শহর থেকে লোক এসেছে শুনে বুড়ি ছুটতে ছুটতে হাঁপাতে হাঁপাতে এসেছে। আমাদের সামনে সে কিছুতেই খাটিয়ায় বা চেয়ারে বসবে না। আমরা নাকি জ্ঞানীগুণী লোক। তাকে বার বার হাতে ধ'রে বললেও সে মাটির দাওয়ায় বসল। তখন আমিও নেমে মাটির দাওয়াতেই বসলাম। অত বুড়ো মানুষের সামনে উঁচু আসনে বসা যায় ? সে বার বার আমায় বলতে লাগল 'তিজনবাইকে কেউ কিছু শেখায়নি মা। ও নিজে নিজে শিখেছে। উও ফোটোসে জ্ঞান পাই।'
ফোটো মানে ও বলতে চাইছে ঠাকুর। ঠাকুর তো বাড়িতে বাড়িতে ফ্রেমে বাঁধানো ফটোই। তাই 'ফোটোসে জ্ঞান পাই।' গ্রামীণ মানুষের এইসব ভাষার ব্যবহার খুব মজার।

আমাদের সঙ্গের ছেলেটি নওল। তার সঙ্গে এদের সবারই খুব ভালো আলাপ পরিচয় আছে। সে বলল, 'বুড়িমা, তোদের এখানে অমুক গান কোথায় হয় ?' —নওলের তো এইসব খুঁজে বেড়ানোটাই কাজ। ও হিন্দীভাষা নিয়ে পড়াশোনা করেছে, একেবারে চাষী পরিবার থেকে পড়াশোনা ক'রে উঠে এসেছে। কবিতা লেখে। চাকরিতে ঢুকেছে। কাজটাকে ও ভালোবাসে। ভয় নেই, ডর নেই, সাইকেল তো সাইকেল, হেঁটে তো হেঁটে—কোথায় না কোথায় চ'লে যায়, এইসব নানান লোককলার ধরণের খোঁজ করতে। এদের দিয়ে কাজ করায়, এদের সঙ্গে কাজ করে। অসম্ভব পরিশ্রমী। ফলে এইসব লোকগুলো ওকে ভালোবাসে। বুড়িকে ও কিছু টাকা দিল, ঐ গানের খোঁজ করতে। বলল— 'তোকে আসতে হবে না। আমি যাব তোর কাছে। তোকে নিজে যেতে হবে না। তুই খালি খোঁজটা জোগাড় ক'রে দে। বাদবাকি কাজ আমি করব।' বুড়ি বললে, 'না বাবা, তুই আমায় টাকা দিয়েছিস, আমিই যাব।' নওল আর কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারে না যে তার জন্যে বুড়ির এই বয়সে অতটা পরিশ্রম করবার দরকার নেই। বুড়ি যাবেই। এত গর্ব হ'লো আমার। আমার দেশের এইসব গরীব মানুষের এইরকম মর্যাদাবোধ আমাকে আপ্লুত করে। এইরকম আরো ঘটনা আমি জানি।

এর মধ্যে তিজনবাই মাথায় একটু তেল দিয়ে একটা বিনুনি ক'রে এসেছে। এসে আমায় জিজ্ঞেস করলে— 'কি শাড়ি পরব ?' আমি ভোপালে ভিডিও-তে

দেখেছিলাম তিজনবাই শহুরে ধরণে শাড়ী পরেছে, জামা-ও তাই। এবং বাঁ হাতে বিরাট একটা ঘড়ি। আমি তা চাই না। তাড়াতাড়ি বললাম আপনি যখন দেশে গাঁয়ে করেন, কি পরেন ? তিজনবাই দুটো ছাপা নাইলনের শাড়ি এনে সামনে দাঁড়াল। আমি বলি, 'আপনার ছত্তিসগড়ী শাড়ি নেই ?' বললে, 'হ্যাঁ, আছে।' বললাম 'তাহলে তাই পরুন !' তখন সে কুঁচকে রাখা নারাঙী রঙের সরু-পাড় গ্রাম্য তাঁতের কাপড় নিয়ে এল। আমি খুশি হ'য়ে ব'লি, 'হ্যাঁ, এইরকমই তো সুন্দর।' শাড়িটার রঙটা, ধরণটা সত্যি খুব সুন্দর। তিজনবাই সামনে আঁচল দিয়ে কাপড় পরল। তারপর সামান্য সাজগোজের সরঞ্জাম নিয়ে আয়না নিয়ে বসল। মুখে সামান্য লিকুইড মেকআপ লাগিয়ে পাউডার দিল। চোখে কাজল পরল। ডগডগে ক'রে সিঁদুর পরল, ফোঁটা পরল। পায়ে তোড়া ছিল। হাতে কয়েকটা কাঁচের চুড়ি ছিল। তার সঙ্গে আরও চুড়ি পরল। গলায় পেতল (নাকি সোনা-ই !) আর পুঁথি দিয়ে গাঁথা গয়না পরল। কানে গয়না পরল। বাহুতে রূপোর গয়না। হাতের গলার গয়না পরতে পরতেই সে তার বাজনাদারদের সুর ধরানোর কাজ শুরু ক'রে দিয়েছে। তারা একটা খাটিয়াতে বসেছে। পেটি মাস্টার, তবলা বাজিয়ে। পেটি মাস্টার বলে যাঁরা হারমোনিয়ম্ বাজান তাঁদের। ওর সঙ্গে আরো কিছু লোকজন থাকে। আমরা যাওয়াতে হঠাৎ-আয়োজন ব'লে আমরা সবটা পাইনি। তম্বুরা আর হারমোনিয়মের সুর মেলানো হ'লো। তবলার সুর বাঁধা হ'লো। তিজনবাই অভিনয় শুরু করল।

ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় পাশাখেলার ঘটনা থেকে শুরু হয় কথকতা। আমি দ্রৌপদীর কাহিনী নিয়ে নাটক ক'রি শুনে ও দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের অংশ বাছল।

হ্যাঁ, শুরু হ'ল 'কথা'। ভীষণ উজ্জ্বল সেই 'কথা'। মধ্যে মধ্যে খাটিয়ায় ব'সে পড়ে। আর তখন তম্বুরা বাজিয়ে গান। আবার কথা ! হ্যাঁ, তিজনবাই চ'লে ফিরে কথকতা করে। পুনারামের মতন বা ঝাড়ুরামের মতন নয়। এবং এঁরা তিজনবাই-কে বিশুদ্ধ বলতে অস্বীকার করেন। কিন্তু এই দুরকম রীতিই পাণ্ডোয়ানির মধ্যে আছে। তবে এদের মধ্যে আরেকটা ধারণাও আছে। তা হ'লো — তিজনবাই লেখাপড়া জানে না কাজেই মহাভারতের শুদ্ধরূপ বর্ণনা করা তিজনবাই-এর পক্ষে সম্ভব নয়। সেসব যাই-ই হোক—আমাদের সামনে খুলতে লাগল তিজনবাই-এর বহুমাত্রিক অভিনয়ের রূপ। পাশাখেলার শেষে দ্রৌপদীকে পণ রাখা, যুধিষ্ঠিরের হেরে যাওয়া, তারপর কৌরবদের আনন্দ। 'কউরোঁ খলখলাকে হাস উঠে !' এইরকম অসম্ভব সুন্দর শব্দচয়ন— যা নিমেষে ছবিটাকে স্পষ্ট ক'রে দেয়। তারপর দ্রৌপদীর কেশ আকর্ষণ ক'রে সভায় নিয়ে আসা—তাকে অপমান করা ; কৃষ্ণের করুণায় দ্রৌপদীকে বস্ত্রহীন করতে দুঃশাসনের অপারগতা এসবই বর্ণনা ক'রে যায় তিজনবাই। সঙ্গে কি গান ! এরপর ধৃতরাষ্ট্র ধিক্কার দেয় নিজপুত্রকে, এবং গান্ধারীকেও—এইরকম পুত্রের জন্ম দেবার জন্যে। তারপর ধৃতরাষ্ট্র বলে, 'বেটি তুই বর নে।' দ্রৌপদী তিনটি বরে স্বামী পুত্র-ধনসম্পত্তি মুক্ত করে (মহাভারতে দুটি বরের কথা বলা

আছে, আর ধনসম্পত্তি চাওয়ার কথাও বলা নেই, সব পুত্রদের মুক্ত করার কথাও বলা নেই।), ধনসম্পত্তি —ওর ভাষায় 'মালখাজানা'। ধৃতরাষ্ট্র বলে, 'আরো বর নে।' তিজনবাই দ্রৌপদী হ'য়ে দর্পের সঙ্গে বলে,— 'ম্যায় ছত্রানী হুঁ, ম্যায় চওথা বর নহী মাঙুঙ্গী।' বর নিয়ে রাজ্যে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অভিনয় হয়। তিজনবাই শেষ ক'রে গোবিন্দকে স্মরণ করে। এইটা ওদের প্রথা।— পুনারাম ঝাড়ুরাম এক হাতে তম্বুরা রাখেন, এক হাতে কাঠতাল বাজান। অন্তত পুনারামকে দেখেছি তম্বুরা তিনি বাজান না। তিজনবাই কিন্তু তম্বুরা বাজিয়ে গান করে। আর একটা অসাধারণ ক্ষমতা তিজনবাইয়ের, তা হ'লো—পজ্ নেওয়ার ক্ষমতা। এবং পজ্ নেওয়ার পরে গলা একেবারে অন্যরকমভাবে বার করা। প্রায় প্রত্যেকটা পজ্ই অর্থবহ্। আর ভঙ্গী সম্পর্কেও সে খুব সচেতন। কোন ভঙ্গিতে কেমন দেখাবে!

অন্ধকার নেমে আসছে। আমরা আনমনা। ও-গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। তলপি তলপা গোটানো গেল! আমাদের যেতে হবে ঝাড়ুরামজীর গ্রামে। সেখানে কাজ সেরে তবে রায়পুরে ফিরব। আর পরদিনই রওনা হ'তে হবে বিলাসপুর। সেখানে আরেকদল অপেক্ষা করছে। কাজেই ফিরে আসতেই হবে। কিন্তু সত্যি বলছি ঐ মুহূর্তে তিজনবাই ছাড়া আর কোনো আকর্ষণ ছিল না আমার কাছে পৃথিবীতে। একজন নিরক্ষর গ্রামীণ মহিলা এরকম ব্যক্তিত্বময়ী হ'তে পারে আগে কখনো কল্পনা করিনি। না, কল্পনা হয়তো করেছি নানান বই প'ড়ে কিন্তু এখন তো শুধু কল্পনা নয়, কল্পনা এখন আমার সামনে রূপ ধ'রে দাঁড়িয়ে। কি অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব! কি আকর্ষণ তার!—মনে হ'চ্ছিল তিজনবাই-এর ঐ দাওয়াতে ব'সে এক অদ্ভুত অনুভব পাওয়া যায়। মনে হ'চ্ছিল এরপর সারারাত এবং আবার সারাদিন ওর অভিনয় দেখা যায়, দেখে যাওয়া যায়। নেশাগ্রস্ত লাগছিল। আমি বললাম— আপনাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। তিজনবাই খুব হাসল, বলল—'চলো, মা, গাড়ি পর্য্যন্ত ছেড়ে আসি।' হাতে হাত ধ'রে গ্রাম্য পথ বেয়ে আমরা হাঁটছি। রাঙামাটির পথ। অন্ধকার ঘন হ'চ্ছে। একটা ছবি তুললেন আমার স্বামী আমাদের দুজনের। সঙ্গে সঙ্গে চ'লেছে এক দল মেয়ে পুরুষ কাচ্চা-বাচ্চা। শহুরে জীব দেখলে গ্রামের মানুষের যা অবধারিত প্রতিক্রিয়া তাই। গল্প করতে করতে গাড়ির কাছে যখন পৌঁছলাম তখন আমরা বন্ধু। তিজনবাই-এর সঙ্গে যারা বাজাচ্ছিল তারাও এসেছে। ভিড় ক'রে সবাই দাঁড়িয়ে। এরা সবাই যেন খুব খুশী আমরা যাওয়াতে। এই খুশীটা আমাদেরও খুশী করছিল। আমাদের ঝোলাঝুলি গাড়ীতে তোলা হ'লো। বিদায় নেওয়া আর শেষ হয় না। একথা-ওকথা—কথা চ'লতেই থাকে, চ'লতেই থাকে। তার মধ্যে দু'পক্ষেরই প্রধান কথা—আবার কবে দেখা হবে?

এই আশ্চর্য জিনিষ আমি বেশ কয়েকবার লক্ষ্য করলাম। বেশবাস, আচার-আচরণ, বড় হবার ভিত্তি ও প্রেক্ষাপট এইসবের আকাশপাতাল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও একটা মানুষ আরেকটা মানুষের খুব কাছের জন হ'য়ে উঠতে

পারে। এটা কি শিল্পের কাজ যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে বেশী হয় ? জানি না। অন্যত্রও নিশ্চয়ই হয়।

সন্ধ্যে গাঢ় হ'য়ে আসছে। নওল এবার তাড়া লাগাল, -'দের হো রহী হ্যায়।' হ্যাঁ, বটেই তো। সামনে যে অনেক কাজ। শুধু তিজনবাই-এর হাত ধ'রে থাকলে কি ক'রে চলবে ? গাড়ীতে উঠে বসলাম। গাড়ির চালক-ও অস্থির হ'য়ে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট দিল। রাঙা ধূলোয় আর সন্ধ্যার আধো আঁধারে হাস্যময়ী তিজনবাই আর তার দলবল মুহূর্তে ঝাপসা হ'য়ে গেল। কিন্তু ঐ প্রতিটি ছবি আমার মনের মধ্যে জীবন্ত হ'য়ে রয়েছে।

জর্জমামা

মহামুশকিল ! 'আমার প্রিয় পুরুষ'—এই শব্দ তিনটে উচ্চারণ করলে যে ছবিটা আসে তা আমাকে এতটুকুও উৎসাহিত করে না কিছু ভাবতে। কিন্তু, সানন্দার সম্পাদকের পক্ষ থেকে শ্রীশংকরলাল ভট্টাচার্য মশাই নাছোড়বান্দা— কিছু না ভাবিয়ে তিনি ছাড়বেনই না—
'আচ্ছা অমুক কবি কি আপনার প্রিয় হ'তে পারেন না ? কিংবা—অমুক পরিচালক ?'
সত্যি বলছি ঐ শব্দ তিনটে উচ্চারণ করলে কোনো মুখই চোখের সামনে ভাসছে না ! অসহায় আমি। এইরকম অসহায়তাকে শুনেছি অস্বাভাবিকতার নামান্তর ব'লে ধরা হয়—ভীত আমি !
তখন ক্রমশঃ নানা প্রসঙ্গের আলোচনা শুরু হ'য়ে যায়। যাকে বলে গপ্পো। এই নানান গল্পের সূত্রে হঠাৎ ওঠে জর্জমামার প্রসঙ্গ। জর্জমামা— মানে দেবব্রত বিশ্বাস। তাঁর একটু গল্প শুনেই শ্রীভট্টাচার্য তৎক্ষণাৎ অনুরোধ করেন এই প্রসঙ্গে কিছু লিখতে।

'আমার প্রিয় পুরুষ' বলতে যে প্রতিচ্ছবি তৈরী হয়, তার সঙ্গে জর্জমামার যে ছবি আমার মনে রয়েছে—তার কোনো সম্পর্ক নেই। একেবারেই নয়। কিন্তু জর্জমামা কিছুদিন আমার খুব আপন হ'য়ে উঠেছিলেন।

আমি যখন খুব ছোট্ট তখন জর্জমামা নাকি আসতেন আমাদের রোডের বাড়ীতে। 'ছেঁড়াতার' নাটকে পার্টও করতেন। 'চার অধ্যায়'-এর আবহ কেবল গলার আওয়াজ দিয়ে, তান ব্যবহার ক'রে জর্জমামারই তৈরী করা ছিল। কিন্তু সেসব আমার মনে নেই, কেবল গল্প শুনেছি।

একটু বড় হবার পরে, যখন রেডিওতে রবিঠাকুরের 'ডাকঘর' নাটকে অভিনয় করেছি—হঠাৎ জর্জমামা হাজির। সংবাদ এল জর্জমামা নীচে গাড়ীতে অপেক্ষা করছেন, একবার আমায় দেখতে চান, শরীরের জন্য ওপরে

উঠতে পারবেন না। দৌড়ে গেলাম মা, আমি। অমলের অভিনয়ের জন্য অনেক প্রশংসা করলেন, তারপর চ'লে গেলেন।

এর পর বহুদিন কেটে গেছে। আমার বিয়েও হ'য়ে গেছে।
সেটা '৭৮ সালের একটা দিন—সকালে, একটু বেলার দিকে বাবা ফোন ক'রে বললেন,
"জর্জ তোকে যেতে বলেছে। আমি গিয়েছিলুম ওর বাড়ীতে। বলছিল মেয়ে কি করছে! আমি বললুম অনেক কিছুই করছে তাই কিছুই হবে না ওর দ্বারা। তাতে বললে, 'আমার কাছে পাঠায়ে দিবেন, আমি মন্তর দিয়া দিমু'। তো তুই যাস একবার।"

এক সকালে বাবার কাছে নির্দেশ নিয়ে বাড়ী খুঁজে বার ক'রে আমি উপস্থিত হ'লাম জর্জমামাব সামনে। তারপরের কথোপকথন এইরকম—
—কে ?
—আমি শাঁওলী।
—ও! বস! কে আসতে কইল ?
—বাবা।
—কি কইল ?
আমি বর্ণনা ক'রি। মুখ টিপে হাসেন। তারপর নানান গপ্পো জুড়ে দেন। এবং হঠাৎই ব'লে ওঠেন—
—গান গাও ?
—একটু একটু। নাটকের জন্য।
—কোন নাটকের জন্য ?
—রাজা।
—কি গান ?
—প্রথমে 'ঐ আসনতলে....' 'ওহে জীবনবল্লভ...' তারপর—বাধা দিয়ে বলেন,
—'ঐ আসনতলে'-টা গাও দিকি!

তাঁর সামনেই হারমোনিয়ম থাকত। যাঁরা তাঁর কাছে গেছেন তাঁরা চোখ বুজলেই তা দেখতে পাবেন। হারমোনিয়মে সুর ধরেন জর্জমামা।
আমি ঘামতে শুরু ক'রি। স্বর বেরোয় না। জর্জমামার সামনে আমি গাইব গান ? আর সে-ও 'ঐ আসনতলে!' চুপ ক'রে চেয়ে থাকি আমি—গান আর বেরোয় না গলা দিয়ে। গান শুরু না হওয়াতে জিজ্ঞাসু চোখ তুলতেই আমি ব'লে উঠি,—
—ভয় করছে!
অতি স্নেহে জর্জমামা বলেন,—
—আরে মাইয়া তোমার নাটক রেডিও-তে শুইন্যা আমি কাইন্দ্যা ম'রি আর তুমি কি না আমার সামনে ভয় পাও ? গাও গাও।
গাইলাম। সে যে কি কষ্টে! গানটা পুরো জানতামও না। নাটকে যে দু'-লাইন গাইতে হ'তো সেটুকুই জানতাম, কাজেই সেটুকু গেয়ে চুপ ক'রে গেলাম। বললেন,

—তারপর ?
—আর তো জানি না। ঐটুকুই গাইতে হ'তো।
—সেকি !
(এমনটা বোধহয় জর্জমামার পক্ষে অকল্পনীয়।).
দেখ, ঐ কোণাতে স্বরলিপির বইগুলো আছে, ৩৭ নম্বর বইটা দাও।
বার ক'রে নিয়ে এলাম বই। গানটা বার করা হ'লো।
বললেন,
—এইবার গানটা পুরোটা শিখে নাও। –আমি তো অবাক হ'য়ে চেয়ে আছি। এমন সৌভাগ্য তো কল্পনাই করিনি ! আমি যেন বিশ্বাস করতে পারছি না খ্যাতনামা 'বিতর্কিত' শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস নিজের থেকে আমাকে গান শেখাতে চাইছেন !

শেখা হ'লো গান। শিখিয়ে টিখিয়ে বললেন,
—এই হ'লো মন্তর। কাউকে বোলো না। এ খালি তুমি জানবে আর আমি জানব। (পরে যে জর্জমামাই কতলোককে আমার গানের কথা বলেছেন !) তুমি তো দেখি স্বরলিপি পড়তে জান ! (কি ক'রে যে বুঝতে পারলেন সে-কথা সেও আর এক বিস্ময়। আমি তো সদ্য ভর্ত্তি হওয়া ছাত্রীর মত ওঁকে অনুসরণ ক'রে মন দিয়ে গান শিখছিলাম। দু-একবার হয়তো নজর পড়েছিল সামনে খোলা স্বরলিপির দিকে—তাতেই ?) এই খণ্ডটা কিনে, গানটা অভ্যাস ক'রে পরদিন আমাকে শোনাবে।

কেমন ক'রে, কিরকম ঘোরের মধ্যে যে সেদিন বাড়ী ফিরেছি ! বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না ঘটনাটা ঘটেছে !! আমি যাব ঐ মানুষটার কাছে গান শিখতে !
গেলাম। প্রথমে সপ্তাহে একদিন। পরে দু-দিন ! তিনদিনও ! যেরকম সুবিধে। বলতেন,
—শিখে নাও। সব শিখে নাও।
কত গান শিখিয়েছেন। উৎসাহ দিতে জর্জমামার জুড়ি ছিল না। কত প্রশংসা যে করতেন ! শুনলে মনে হ'তো আমি কি যেন এক ভয়ানক গাইয়ে ! শেখাতেন খুব যত্ন ক'রে। সুরের মধ্যে দিয়ে মানে কি ক'রে প্রকাশ করতে হয় সুন্দর ক'রে বোঝাতেন। একদিন একটা নতুন গান তুলে নিয়ে গেছি। শুনিয়েছি। গান শেষ ক'রে থামলুম। জিজ্ঞাসু চোখে মতামতের অপেক্ষায় তাকিয়ে। বললেন,—
—এটা রবীন্দ্রসঙ্গীত হইছে, 'গান' হয় নাই।
একদিন হয়তো রেয়াজের ফলে খোলা আওয়াজ বেরিয়েছে গলা দিয়ে। জর্জমামা কি অসম্ভব খুশী হ'য়ে উঠেছেন !
এইরকম ক'রে জর্জমামার সঙ্গে একটা বেশ সম্পর্ক গ'ড়ে উঠল !

একে একে আমার বেশ অনেকগুলো স্বরলিপির বই কেনা হ'য়েছে। এর মধ্যে দু-একটা বেশ শক্ত গান শিখিয়ে বলেছেন,

—এই গানটা intellectual মহলে গাইবা। তারপর জিজ্ঞেস করবা 'মানে-টা কী ?'—বলেই মুখ টিপে হাসি।
কোনো গান শিখিয়ে বলেছেন,
—এইটা এখন গাইবা না, বুড়া হইলে গাইবা।

একটা গল্প জর্জমামা বার বার বলতেন প্রখ্যাত অভিনেতা উত্তমকুমার সম্পর্কে। তিনি নাকি একবার কোনো ত্রাণ-তহবিলে টাকা তোলার জন্য অনুষ্ঠান করেছিলেন সম্ভবতঃ শিল্পীসংসদের পক্ষ থেকে। জর্জমামাকে সেইখানে গান গাইবার জন্য অনুরোধ করতে এসেছিলেন। তখন জর্জমামা বাইরে গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। উত্তমকুমার এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন জর্জমামাকে। জর্জমামা বলেছিলেন, 'কে ?'
—'আমি উত্তমকুমার,' সসংকোচে বলেছিলেন তিনি।
জর্জমামা জিজ্ঞাসা করেন 'কে উত্তমকুমার ?'
উত্তমকুমার অত্যন্ত বিনীতভাবে জবাব দিয়ে বলেন, 'আমি ঐ একটু সিনেমায় অভিনয়-টভিনয় করি।' জর্জমামার খুব ভালোলেগেছিল তাঁকে। তখনই। তারপর কি ভাবে অনিচ্ছুক জর্জমামাকে রাজী করিয়েছিলেন তিনি, কিভাবে জর্জমামার সব শর্ত্ত মেনে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন গান গাওয়াতে—এ সমস্তটাই খুব সুন্দর ক'রে বর্ণনা করতেন জর্জমামা। তখন ঐ পরিচয়ে মানুষ হিসাবে উত্তমকুমার সম্পর্কে জর্জমামার কেমন স্নেহের এবং সম্মানের অনুভব হ'য়েছিল বলবার ভঙ্গিতে সেটা ধরা পড়ত। আর কতবার যে বলেছেন এই কাহিনী। এখনও যেন প্রত্যেকটি বাক্য বলবার সময়ে তাঁর ভাবটি দেখতে পাই।

একদিন গিয়ে দেখি আমার জন্য তিনটে স্বরলিপির বই কেনা আছে। বললেন,
—এগুলো নিয়ে যাও, গান তুলে তুলে আমাকে শুনিয়ে যাবে, তাই দিলাম।
লজ্জায় আনন্দে সে কি যে ভাবখানা হ'য়েছিল আমার সে প্রকাশ করতে পারিনে ! বললাম—
—লিখে দাও।
দুটোতে লিখলেন 'শাঁওলীকে এক বুড়ো।'
একটাতে— 'শাঁওলীকে মন্ত্রদাতা।'

সেই গান শেখার সময়টা আমার যে কি আনন্দে কেটেছিল ! সেইসময়ে একজন অসুস্থ নিঃসঙ্গ মানুষকে দেখতুম। অবশ্য অনেক লোকই ভালোবেসে ওঁর দেখাশোনা করতেন। আমিই কিছু করতে পারিনি কখনো, কেবল নিয়েইছি।

একদিন গিয়ে দেখেছিলাম খুব অসুস্থ। কেউ নেই সেদিন। তাই খবরাখবর দেওয়া, ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা— এইরকম কিছু স্বাভাবিক কাজ ক'রে দিয়েছিলাম। একটা প্রয়োজনীয় ওষুধ পাওয়া যাচ্ছিল না। সেটার

একটু খোঁজ ক'রে ক'রে অনেকগুলো ফাইল জোগাড় ক'রে দিয়েছিলাম। সে খুব সামান্য কাজ।

এর কয়েকদিন বাদে আমি নিজেই বড় অসুস্থ হ'য়ে পড়ি। আর যেতে পারিনি। অমন দুর্লভ সুযোগ পেয়েও তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারিনি।

হঠাৎ এক ভোরে মা কাঁদতে কাঁদতে ফোন করল— 'ওরে রেডিয়োতে বলল জর্জ—' ফুঁপিয়ে উঠল মা। আমার বুকটা যেন হিম হ'য়ে গেল।

রাসবিহারী এ্যাভেন্যুর বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য—অত সকালেই। ওখানে কতজনাই যে বললেন, —'তোমার কথা খুব বলতেন! তুমি নাকি খুব দেখাশোনা করেছ? তুমি নাকি ওষুধ এনে দিয়েছিলে?'
তখন আমার যে কেমন লাগছিল কি ক'রে বোঝাই! ঐ সামান্য কাজের কথা এত লোককে এমনভাবে বলেছেন যেন আমি কতই না করেছি ওঁর জন্যে! মনের মধ্যেটায় কি যে হ'চ্ছিল তখন বোঝাতে পারিনে।

পরের দিন আমি আর জর্জমামার একজন খুবই অনুগত, যিনি নানাভাবে সাহায্য করতেন, ওখানেই তাঁর সঙ্গে আলাপ—আমরা দুজনে গিয়েছিলাম ঐ বাড়ীটাতে—ঐ ঘরটা ঐ হারমোনিয়মটা একটু দেখব। জর্জমামার বহুদিনের ভৃত্য শ্রীকান্ত এবং অনন্ত—যারা বোধ করি সবচেয়ে বেশী দায় নিয়েছিল—তাদের সঙ্গে একটু কথা বলব, হয়তো মনটা হাল্কা হবে! হয়নি। খুব তিক্ত এক অভিজ্ঞতা নিয়ে নিঃশব্দে ফিরে এসেছিলাম আমরা।

একদিন জর্জমামাকে জিজ্ঞাসা
—আচ্ছা জর্জমামা, রবিঠাকুরের এত বিশ্বাস করবার শক্তি কোত্থেকে জুটত বল তো! কত অসম্ভব আঘাতই তো পেয়েছেন জীবনে!
—**জর্জমামা অম্লানবদনে বললেন,**
—বিশ্বাস করত না তো! ও হ'লো একরকম অভিনয়! আসলে বিশ্বাস করত না।
আমি বুঝি বললাম,—
—এতই যদি ফাঁকি তবে তুমি ওঁর গান গাও কেন?
জর্জমামার তৎক্ষণাৎ উত্তর—
—সোজা ব'লে গাই।
ব'লেই আবার মুখ টিপে হাসি।

জর্জমামা চ'লে গেলেন। সেইদিনকার বা ঠিক তার পরের দিনের তিক্ত স্মৃতি যা অবধারিতভাবে মনে পড়ে তা বার বার ভুলে যেতে চাই।

মনে রাখতে চাই—ঐ মুখ টিপে হাসি। বুড়ো আঙুল দেখিয়ে গাইতে গাইতে বলা—

তোমরা যা বল তাই বল
আমার লাগে না মনে !

['সানন্দা' পত্রিকায় সে-সময়ে 'আমার প্রিয় পুরুষ/ আমার প্রিয় নারী' এই পর্য্যায়ে কিছু লেখা বেরিয়েছিল। সেই সময়ে এটি লেখা। লেখার পর কৃতজ্ঞ বোধ করেছি 'সানন্দা'-র কাছে, জর্জমামার জন্য কখনো যে কিছু করতে পারিনি তা সর্বসমক্ষে স্বী'কার করতে পেরে। তখন শব্দসংখ্যার সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে কিছু কিছু কথা ব'লে ওঠা যায়নি। এই বইয়ে সেগুলি সংযোজিত হ'লো।]

আমার মা

এখনো মা বলতেই মায়ের সেই কষ্ট পাওয়া মুখটাই মনে প'ড়ে যায়। ঐ মুখটাই বারবার মনে পড়ে। ঐ মুখটা, ঐ যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট মুখটা বারবার বলেছে, 'আমি আব পারছি না, আমার আর কিছু দরকার নেই, আমাকে একটু বেশী ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও।' তখন আমাদের দাঁত চেপে চুপ ক'রে থাকতে হ'য়েছে।

'না,—না, এই তো কমে যাবে' —এইরকম ছেলে ভুলোনো কথা তখন আর মুখ দিয়ে বার করা যেত না। একটা পর্বতের সামনে মানুষ যেমন নিজেকে তুচ্ছ বোধ করে তেমনি এক দানবসদৃশ মৃত্যুর যন্ত্রণার সুমুখে এইসব সান্ত্বনাবাক্য অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে পড়ে। তাই আমাদের দাঁত চেপে চুপ ক'রে থাকতে হ'য়েছে।

এই গত ২২শে এপ্রিল 'সি টি. স্ক্যান' করা হ'য়েছে। সেদিনই জেনেছি কি ভয়াবহ পুনরাক্রমণ ঘটেছে শরীরে। ডাক্তার ডেকে বললেন,

'শাঁওলী, তুমি মনে মনে প্রস্তুত তো? বুঝতে পারছ তো ব্যাপারটা? উনি আমাদের সঙ্গে আর বেশীদিন নেই। উই হ্যাভ লস্ট দ্য ব্যাট্‌ল্‌, উই হ্যাভ কাম টু দ্য এন্ড্‌ অফ আওয়ার জার্নি।'

ব্যাট্‌ল-ই বটে! সে কি লড়াই কি লড়াই! '৮৭-র অক্টোবর থেকেই অনেক চিকিৎসা চলছিল। ক্রমশঃ অসুখটা তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করছিল—রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস। সেটা যে এমন ভয়ঙ্কর রোগ এর আগে তা জানাই ছিল না। মায়ের হাতের জোর ক'মে যেতে লাগল। মায়ের লম্বা সুন্দর আঙুলগুলো বেঁকে যেতে লাগল। যে ডাক্তার প্রথম এক্স-রে প্লেট দেখে আমাদের জানান অসুখটা রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস—তিনিই বলেন এবারে মা ধীরে ধীরে পঙ্গু হ'য়ে যাবে—সেই সত্য মাকে বলতে হবে— 'গ্রেসফুলি' এখন এটা এ্যাকসেপ্ট করতে হবে! কি অসম্ভব কথা! একজন পঙ্গু হ'য়ে যাবে—যার মঞ্চে চলাফেরার 'গ্রেস' দেখে মানুষ মুগ্ধ হ'য়ে যায় তাকে নাকি গ্রেসফুলি এ্যাকসেপ্ট করতে হবে এখন থেকে সে একজন 'ক্রিপ্‌ল্‌'!! এ কি বলা যায়? —বলতে পারিনি। সত্যি ব'লেও বিশ্বাস করতে পারিনি। মনে হ'চ্ছিল কোনো কি উপায় থাকবে না ভালো করবার?— কিন্তু ছিল না। ক্রমশঃ

জানতে পারছিলুম এর ভয়াবহ স্বরূপ। ক্রমশঃ জানছিলুম ইওরোপের বিভিন্ন দেশে এর প্রবল আক্রমণ শুরু হ'য়েছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মহিলারা আক্রান্ত হন। প্রচুর গবেষণা ক'রেও কোনো দেশই এর কারণ বা চিকিৎসা কোনোটাই বার করতে পারেনি। স্টেরয়েড একমাত্র ওষুধ যা সাময়িক উন্নতি ঘটায়। বাচ্ছাদের হ'লে বাঁচানো যায় না। এইসব খবর শুনেছিলাম '৮৭-র শেষে এবং '৮৮-র গোড়ায়। আর দেখছিলুম মায়ের সুন্দর লম্বা আঙুলগুলো বেঁকে যাচ্ছে, জোড়গুলোতে কালো ছাপ, কাঁধের জয়েন্টে ভীষণ যন্ত্রণা, পাশ ফিরে শুলে কষ্ট হয়। আর রোগা হ'য়ে যাচ্ছে মা।

১৯৮৮-র জুলাইতে হঠাৎই ধরা পড়ল ক্যানসার। সেই জুলাই-এর প্রত্যেকটা তারিখ ছিল ভয়াবহ। কি অসম্ভব চাপ গেছে সেই সময়টায়। আর মাকে তো বুঝতে দেওয়া যাবে না যে মায়ের কি হ'য়েছে,— সে ছিল এক সাংঘাতিক দায়িত্ব। যাঁরা জানতেন তাঁদের প্রত্যেককে আলাদা ক'রে সাবধান করা হ'তো মায়ের সামনে অসতর্ক না হ'য়ে পড়েন। সেইজন্যেই আরো সবার কাছে স্বীকার করা হ'তো না যে ক্যানসার হ'য়েছে। সে-সময়েও মায়ের বাঁচার আশা ছিল না। কেমোথেরাপি হ'লো—ভয়াবহভাবে 'ডব্লু বি সি' কমতে লাগল, হিমোগ্লোবিন কম। বোতলের পর বোতল রক্ত দেওয়া হ'তে লাগল। বাড়ীতে একটা ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট তৈরী করা হ'লো। ২৪ ঘন্টা সিস্টার, ২৪ ঘন্টা ডাক্তার। ইমার্জেন্সির সবরকম ব্যবস্থা। সমস্তরকম। প্রচুর লোকের সহায়তা পাওয়া গিয়েছিল বলেই সে এক অসাধ্যসাধন করা হ'য়েছিল বাড়ীতে। রক্ত দিয়েছিল কারা ? সমস্ত থিয়েটারের ছেলেমেয়েরা ! যারা থিয়েটার করে, যারা থিয়েটার ভালোবাসে। কেউ বা সরাসরি শিখেছে মায়ের কাছে, কারোর বা পরিচয়ই নেই। এই সময়ে মায়ের কিন্তু লোক চিনতে অসুবিধা হ'তো না। নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশ করতে পারত। কাকে কখন দেখতে ইচ্ছে তাও বলতে পারত। খালি বুঝতে পারত না চিকিৎসার এত এলাহি ব্যবস্থা হ'য়েছে কেন ! আমাকে জিজ্ঞাসা করত—
—'আমার কি হ'য়েছে ? এত আড়ম্বর কেন ?'
—একদিন চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করল,
—'অনেক খরচ হ'চ্ছে না রে ?'
আমি বললুম,
—'এখন এসব তোমার ভাবতে নেই। এখন তুমি কেবল বিশ্রাম নেবে। ডাক্তার যা বলে শুনবে আর একটু খাবে।'
তখন মা কিচ্ছু খেতে চাইত না। পেটে অনেক জল ছিল, সেগুলো বার করা হ'তো। সেই সময়ে মায়ের নাকে দুটো নল—একদিকে অক্সিজেনের এবং অপরদিকে খাওয়ানোর জন্য। ইউরিন ক্যাথিটার পরানো। এক হাতে ফ্লুইড চলছে, অপর হাতে ব্লাড। হাত ফুলে যাচ্ছে ক্রমাগত ড্রিপ দেবার ফলে। প্রচুর ব্যথার এবং ঘুমের ইঞ্জেকশন পড়ত ব'লে মাঝে মাঝে ঘোরের মধ্যে থাকত। ড্রিপ থেকে ইনফেকশন হ'য়ে কাঁপুনি এবং প্রবল জ্বর হ'তো মাঝে মাঝে। নিঃশ্বাসের কষ্ট হ'তো। একদিন ঐ ঘোরের মধ্যে বিড়বিড়

করছিল—মুখটা কাছে নিয়ে শুনি— বলছে,—
'নিজে খাবে না, খালি আমাকে বলবে খাও খাও।'
—'কে ? কে বলেছে ?'
—'শাঁওলীটা। নিজে খাবে না। খালি আমাকে বলবে খাও খাও।' আমার কিরকম লেগেছিল ? সহজেই অনুমেয় কি ? নাকি যাঁদের এইরকম অবস্থায় পড়তে হ'য়েছে তাঁদের পক্ষেই অনুমেয় কেবল ! কি জানি, বলতে পারব না তো !

এই সময়ে একদিন কার্ডিয়াক এ্যারেস্ট হ'য়ে গিয়েছিল। সেটা ১৭ই জুলাই, রাত ৮টা হবে, আমার চোখের সামনে। মা ছিল না। মা বেশ কিছুক্ষণ ছিল না। কত চিকিৎসকদের প্রহরা, কত মানুষের সেবা, ভালোবাসা মাকে ফিরিয়ে আনল। মনে আছে, অক্সিজেন দেওয়া শুরু হ'লো। সাকার মেশিন লাগাতে যাওয়া হবে—লোডশেডিং হ'য়ে গেল। সেই অন্ধকারে মোমের আলোয় ডাঃ কে. বি. রায় কার্ডিয়াক মাসাজ করছেন। সেই ডিউটি বদলের সময়ে তখন দুজন সিস্টার হাজির। মিনতিদি অভিব্যক্তিহীন মুখে মেশিনের মত অর্ডার মাফিক ইঞ্জেকশন দিয়ে যাচ্ছে। তিরিশটা ! চল্লিশটা ! ক'টা আমি জানি না। পারুলদিও কি যেন করছিলেন। মনে পড়ে না। মনে পড়ে জুনিয়ার ডাক্তার সাহা মায়ের মুখে মুখ দিয়ে শ্বাস টেনে মায়ের প্রশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা ক'রে চলেছে।

একটু পরে যখন জ্ঞান ফিরে এসেছে ভালো ক'রে, বাবাকে দেখতে পেয়েছে সামনে। আমার এক মাসী—সিতুমাসী—পায়ের কাছে বসেছিল, তাকেও দেখেছে। খবর পেয়ে অনেকেই এসেছেন, বাইরে কান্নাকাটি হ'চ্ছে। কিন্তু মা তখন বাবা আর সিতুমাসী এই দুজনকে পাশ থেকে নড়তে দেবে না। অত লোক দেখতে চাইছে ! অক্সিজেন চলছে, ঐটুকু ঘরে সবাইকে তো এক সঙ্গে ঢোকানো যাবে না। কিন্তু বাবাকে আর সিতুমাসীকে ঠায় ব'সে থাকতে হ'লো। আর সবাই এক এক ক'রে দেখে এল। তারপরও সারা রাত আমরা ব'সে। ডাঃ রায়ও। সে-সময়ে এইরকম কয়েকদিনই হ'য়েছে। রাত্তিরে সিস্টার ছাড়াও একজন বা দুজন বাড়ীর মহিলা রাত জাগতেন। হয় মাসীরা কেউ, বা আমাদের সঙ্গে থিয়েটার করেন বা আগে করেছেন এমন কোনো মেয়ে বা আমার পিসতুতো বোন বুজু। সে আমার নিজের বোনের বাড়া। সে মাসখানেক প্রায় রোজই রাত জেগেছে। রাত্তিরটা আমাকে সে জাগতে দিত না সচরাচর।

সেই অবস্থা থেকে মা আবার উঠে বসতে, হাঁটতে সক্ষম হ'লো। এতটা উন্নতি হ'তে পারে এই কল্পনা করার কৃতিত্ব ডাঃ সরোজ গুপ্ত ও ডাঃ কে. বি. রায়ের। আমরা যখন মনে মনে হাহাকার করছি এই দুজন মানুষ ভরসা হারাননি। বলেছেন, বার বার বলেছেন—'সম্ভব হবে, দেখা যাক না। হবে !' আর সত্যি, হ'লোও।

তবে এই সেদিন শুনলাম মা যখন উঠে বসতে পারে, হাঁটতে পারে—বেলভিউতে—তখন শ্রীঅম্লান দত্ত ও শ্রীমতী সুতপা ভট্টাচার্য্য গিয়েছিলেন দেখা করতে। মা তাঁদের বলেছেন—'তিন তিনবার জবাব দেওয়ার পর আমি হাঁটছি এতে ডাক্তারদের ভয়ানক কৃতিত্ব তো বটেই, কিন্তু আমার কি হ'লো ?' কথাটা ধাক্কা খাওয়ার মত। যে মা রক্তকরবীর মঞ্চসজ্জার তিন/ চারটে স্তর অসম্ভব দ্রুততায়, অনায়াসে, বার বার অতিক্রম করত, যে মা যথেষ্ট বয়সে ছ' ফুট উঁচু থেকে অবলীলায় লাফ দিতে পারত—সেই মা বিছানা ছেড়ে উঠে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে অপরকে অবলম্বন ক'রে। যে মায়ের এক ঢাল চুল ছিল পিঠের ওপরে, চুল সব উঠে তার চেহারাটাই অন্যরকম হ'য়ে গেছে।

একদিন সেইসময়ে আমারই এক বন্ধুকে বলেছে মা, —'আমি তো এখন নিরক্ষর ! আমি দু-হাতে বই ধরতে পারি না, তাই পড়তে পারি না। আমার আঙুল এমন হ'য়েছে যে আমি কলম ধরতে পারি না, সই পর্য্যন্ত করতে পারি না। এখন আমাকে নিরক্ষর ছাড়া কি বলবে ?' ডাক্তারদের প্রচেষ্টায় বেলভিউ নার্সিংহোমের শেষেরদিকে এবং গোলপার্কের বাড়ীতে মা বই বা খবরের কাগজ পড়তে পেরেছিল, সই করতেও পেরেছিল, একটু আধটু লিখতেও পারত।

ডাঃ গুপ্ত বলেছিলেন এখন মা ক্যানসার-মুক্ত। তবে পুনরাক্রমণ কবে হবে কিছুই বলা যায় না।

মা ক্রমশঃ ভালো হ'তে লাগল, আমরাও নিশ্চিন্ত হ'তে শুরু করলাম। সিসটার দু-বেলা ছিলেনই। ব্যথা কমানোর বড়ি বা ইঞ্জেকশন চলতই। তবুও, তবুও তো ব'সে বাবার সঙ্গে গল্প করতে করতে চা খেত ; মাথায় ঝাঁকড়া নরম চুল গজাল ; বাবা ঠাট্টা ক'রে বলত, 'এগুলো কেটে বেশ নরম কম্বল তৈরী করা যাবে !' মা কপট রাগে বলত, 'খবরদ্দার না !'

সেই পয়লা বৈশাখটায় আমি শিলিগুড়িতে শো করতে গিয়েছিলাম। সেই সপ্তাহতে শিলিগুড়িতে এবং কলকাতায় মিলিয়ে পাঁচটা শো ছিল আমার 'নাথবতী অনাথবৎ'-এর। যাঁরা যাঁরা সেদিন প্রণাম করতে গিয়েছিলেন গোলপার্কে তাঁদের কাছে শুনেছি সেদিন মাকে খুব সুন্দর লাগছিল দেখতে ! চামড়া টান টান, চকচকে ! আর দু-তিন দিন বাদেই আশঙ্কা হ'লো আমাদের— এইরে ! রোগ আবার ফিরে এল না তো !

মা আমাকে টেলিফোনে নালিশ করল—'কাঁধে ব্যথা করছে।' সেদিন রবিবার। সকালে সেই পঞ্চম শো-টা ক'রে বাড়ী ফিরেছি, খুব ক্লান্ত। বললুম, 'এখুনি ব্যবস্থা করছি। তবে আমি একটু বিশ্রাম নিয়ে কাল তোমার কাছে যাব।'

রবিবার এবং শহরে ফোনের এইরকম অবস্থা সত্ত্বেও ডাক্তার এবং এক্স-রে-র ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। সোমবার সকালে এক্স-রে মেশিন নিয়ে গিয়ে ছবি তুলে আনা হবে।

আর সেই সোমবার সকালেই বমি শুরু হ'লো। শুনেই আতঙ্কে বুক কেঁপে উঠল। দৌড়তে হ'লো গোলপার্কে। সঙ্গে সঙ্গে বলা হ'লো বুকের এবং পেটের ছবিও নিতে। সেই রিপোর্টেই ডাক্তারদের সন্দেহ হ'লো। ২২ শে

এপ্রিল সি. টি. স্ক্যান করা হ'লো। স্ট্রেচার এবং এ্যাম্বুলেন্সের বন্দোবস্ত ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছিল মেডিনোভায়। ঐ চার/ পাঁচ দিনের মধ্যেই মা কেমন শুকিয়ে গিয়েছে। যন্ত্রণায়। সেদিন ওখানে একজন যুবক ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল—
—'দিদি !'
সুব্রত দাস। ছেলেটির থিয়েটারে উৎসাহ ছিল ব'লে একটা সময়ে মায়ের কাছে প্রায় প্রত্যহই যেত। মা ছিল তার জেঠিমা। —'দিদি, আমি শুনেছি জেঠিমা এসেছেন। আমি এক্স-রে ডিপার্টমেন্টে, স্ক্যানিং হ'য়ে গেলে ওপরে নিয়ে যাব। কাঁধে নাকি কি— ছবি তুলতে হবে— কি হয়েছে ?' —'কি জানি রে ! কেবলই বলে ডান কাঁধে খুব ব্যথা !' আমার মুখ দেখে সুব্রতর বুঝি মায়া হ'লো। বললে, —'তুমি দাঁড়াও, ভেতরে দেখে এসে তোমাকে খবর দিচ্ছি।'
ফিরে এল সুব্রত খানিকবাদে। ওর মুখটা শুকিয়ে গেছে। বলল,
—'এক্স-রে ক'রে আর লাভ নেই দিদি। কাঁধে ব্যথাটা এখন ইম্‌মেটিরিয়াল। যা হ'য়েছে—তুমি বুঝবে ব'লেই বলছি আর কিছু আশা ক'রো না। পেটের প্রত্যেকটা অর্গ্যানেই মেটাসটসিস্।' অর্থাৎ লিভার কিডনি ইউটেরাস— সব, সবই আক্রান্ত। চেস্টও। আমি বললাম, 'কাঁধে যে ব্যথা বলে !'
ওখানে সবাই বললেন তার পরে, —কাঁধের জয়েন্টে ব্যথার জন্য কিছু ক'রে কিছু লাভ নেই। ওঁকে কষ্ট দেওয়া। দাঁড়িয়ে ছবি তোলাতে হবে। এই অবস্থায় দাঁড় করানো—ধকল হবে খুব। আর শুধু শুধু—আর খুব বেশীদিন তো—চুপ ক'রে গেলেন ওঁরা।

মাত্র ক'টা মাস পেয়েছিলাম আমরা মাকে— কিন্তু লড়াইটা জেতা গেল না। সেই অনিবার্য আক্রমণ। সেই বীভৎস একটা নাম—'ক্যানসার'। তখন কিছু আর করার নেই। ডাক্তাররা তবু চেয়েছিলেন কিছু করতে। কিন্তু মায়ের শরীর যেন ব্যাঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল সমস্ত কিছু। অনেক কাটাকুটি ক'রেও শিরা পাওয়া গেল না। রক্ত দেওয়া হবে। আনা হ'য়েছে তা। ফ্রিজে রাখা হ'য়েছে, সার্জন এলেন। কাটা শুরু হ'লো। যাকে বলে ভেনিসেকশন। প্রথমে পা, তারপর বাঁ-কাঁধ, তারপর আরো দু-একটা চেষ্টা। যখন ঐরকম শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে কেটে শিরা খোঁজবার চেষ্টা করছেন সার্জন—।
দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে কেউই চোখের জল রাখতে পারেনি সেদিন।
বাচ্চা মেয়ের মত ঠোঁট ফুলিয়ে মা আমাকে নালিশ ক'রে বললে,
—'ডান কাঁধটায় ব্যথা ছিল। বাঁ-কাঁধেও হ'য়ে গেল !'
মা তখন আন্দাজ করেছে অসুখটা। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কি, সময় যে একদমই নেই—এসব তো বুঝতে পারত না, তাই কাঁধে ব্যথা নিয়ে নালিশ মায়ের শেষ হ'তো না। ভাবত—ওটার জন্য কোনো ইনভেস্টিগেশন হ'লো না—কেবল পেন কিলার দেওয়া হ'চ্ছে কেন ? —আমরা নিরুপায় হ'য়ে মায়ের সেই চিন্তা, সেই নালিশ দাঁত চেপে শুনতুম।
সেদিন কিছুতেই শিরা পাওয়া গেল না। রক্তও তাই দেওয়া গেল না। শেষ পর্য্যন্ত কিছুই করা গেল না। সেদিন রক্ত দেওয়া হবে জানতে পেরে ছুটে

এসেছিল মঞ্জুদি। বেলভিউতে টানা পাঁচমাস সারাদিনটা মাকে আগলে রাখত মঞ্জুদি, মাকে 'মা'-ই বলত। মায়ের বেডসোর এবং আরো দু-একটি ঘা মঞ্জুদি কিভাবে সারিয়ে তুলেছিল যে বলবার নয়। সেদিন মঞ্জুদি পরিবারের একজন হ'য়ে মুখে আঁচলচাপা দিয়ে চোখের জল ফেলে চলেছিল।

অনেকদিন থেকেই মা মাঝে মাঝে একটু ভুগত। ডাক্তার বলতেন তার অনেকটাই উদ্বেগজনিত। মা বিচলিত হ'য়ে পড়ত খুব তাড়াতাড়ি। মাকে বিচলিত ক'রে দেওয়া খুব সহজ ছিল। আমি একটু বড় হবার পরই এসব গোলমাল থেকে মাকে বাঁচানোর অনেকখানি দায়িত্ব যেন আমাতে বর্ত্তে গেল। সে দায়িত্ব শেয সময় পর্য্যন্ত সাধ্যমত পালন কবার চেষ্টা করেছি। এমনও হ'য়েছে যে পারিনি, বা বাধ্য হ'য়ে চুপ ক'রে থাকতে হ'য়েছে। এসব বেদনা জীবনে থাকেই।

'৮০ সালে মা 'ডাকঘর' প্রযোজনা করতে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল। বিশ্বভারতীর আমন্ত্রণে, ভিজিটিং ফেলো হিসাবে। সে-সময়েও মাকে প্রচুর প্রতিকূলতা সহ্য করতে হয়। মা বোধহয় দু-আড়াইমাস ছিল সেখানে। তার মধ্যে আমাকে তিনবার যেতে হ'য়েছিল কেবল এইজন্যে—মাকে একটু মানসিক সহায়তা দেবার জন্যে। ঠাট্টা ক'রে তখন কেউ কেউ বলত, 'বাবা একবছর এখানে ভিজিটিং ফেলো হ'য়ে রইল, মেয়ের প্রায় টিকি দেখিনি! মা আসাতে তিনবার আসা হ'য়ে গেল!' মা আর আমি দুজনেই হাসতাম। বাবা '৭৭ সালে একবছর শান্তিনিকেতনে ছিল, আমার একবার বৈ যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি।
তৃতীয়বার অর্থাৎ শেষবার অবস্থাটা একটু গম্ভীরই হ'য়েছিল। হঠাৎ এক রাত্তিরে আমার শান্তিনিকেতনের বন্ধু মুনিয়ার ফোন পেলাম,
'শাঁওলী, তুই কালই চ'লে আয়, তৃপ্তিমাসী হাসপাতালে ভর্ত্তি হ'য়েছেন।—অক্সিজেন—হার্ট—'
বাকি কথাগুলো শোনা যাচ্ছিল না। তারপর ফোন কেটে গেল।
অতএব প্রবল উদ্বেগ নিয়ে একা পরদিন ভোরে বর্দ্ধমান লোকাল ধ'রে বর্দ্ধমানে গিয়ে সেখান থেকে বামদেব লোকাল ধ'রে সকাল ১০টার মধ্যে বোলপুরে পৌঁছে সোজা হাসপাতালে। গিয়ে দেখি হার্ট নয়। মুনিয়াও বলতে চেয়েছিল 'হার্ট নয়'—'নয়' শব্দটা আমাদের টেলিফোন ব্যবস্থার দৌলতে শোনা যায়নি। শুনলাম উদ্বেগে পাল্‌স্ রেট এমন বেড়ে গিয়েছিল যে অক্সিজেন দিতে হ'য়েছিল। তখন অনেক সুস্থ। সেদিনই বিকেলে অথবা পরদিন সকালে, ঠিক মনে নেই, মাকে মায়ের পঞ্চবটির কোয়ার্টারে নিয়ে গেলাম। সেই সময়ে খুব সাহায্য করেছিল মুনিয়া এবং টুকুদা—টুকুদা মা চ'লে যাবার ঠিক দু-মাস আগে আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছেন। টুকুদা (রণধীর রায়) সেই 'ডাকঘর' প্রযোজনাব আবহসঙ্গীতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন মায়ের জন্যেই। আরও সাহায্য করেছিলেন সত্যেনকাকা, কাকিমা, তাঁদের ছেলে অংশু, আরো অনেকে। তবু তারপর যে-কদিন মাকে ওখানে থাকতে হ'লো মাকে একা রাখিনি। এবং

এখানকার থিয়েটারের কিছু ছেলে গিয়ে মাকে সাহায্য করেছিল—শেষাবধি তাই প্রযোজনা মঞ্চস্থ হ'তে পেরেছিল। এইরকম অনেকবার হ'য়েছে, অন্য ক্ষেত্রেও

মায়ের একটা মন ছিল খুব মজার। সেটা মাঝে মাঝেই জিনিষপত্তর হারিয়ে ফেলত। বাড়ী তোলপাড়। একদিন তেমনি চশমা হারিয়ে গেছে, খুব চেঁচামেচি হ'চ্ছে। (ওটা প্রায় রোজই হ'তো—হয় চশমা নিয়ে, নয় চাবি নিয়ে, না হয় আর কিছু—অথচ জিনিষটা সামনেই হয়তো প'ড়ে আছে কোথাও!)
—'আশ্চর্য্য! এক্ষুনি দেখলাম চশমাটা এখানে, কোথায় যাবে?'
এর মধ্যে আমি চশমাটা পেয়েছি। চশমাসহ হাত দুটো পিছনে নিয়ে বললুম,—
—'বল দেখি কি আছে হাতে?'
মা খুব সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললে—
—'কি?'
—'চশমা!'
মা বললে,—'ধ্যেৎ!'
আমি বললুম,—'হ্যাঁ!'
মা বললে, —'মোটেই না।'
আমি বললুম—'আচ্ছা বেশ, বাজি!'
মা তৎক্ষণাৎ বললে, —'বাজি!'
আমি বললুম, —'পাঁচ টাকা!'
মা বললে, —'পাঁচ টাকা।'
আমি হাতটা ঘুরিয়ে আনলুম চশমাসহ।
মায়ের মুখটা তখন অবর্ণনীয়। এইসব সময়ে মায়ের একটা অদ্ভুত মজার হাসি ছিল—সেরকম হাসি একমাত্র মাকেই হাসতে দেখেছি। সে-হাসি অনেকেই দেখেছে, যারা দেখেছে তাদের ঠিক মনে পড়বে।
মা এইরকম সহজে হারত ব'লে মাকে খ্যাপাবার জন্যে উৎসাহিত হ'তো সবাই। যে জীবনে কখনো কাউকে খ্যাপায় না তার পক্ষেও মাকে না খেপিয়ে থাকা বেশ শক্ত ছিল।

মায়ের একটা বেড়াল ছিল। সে ছিল কবি। পূর্ণিমা হ'লে সে মাঝরাত্তিরে 'ম্যাও ম্যাও' ক'রে মাকে জাগিয়ে বারান্দার দরজা খুলিয়ে বারান্দার রেলিঙের ওপরে ব'সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকবে। মা বেচারী দরজা খুলে তো আর ঘুমোতে পারে না। কাজেই ব'সে রইল, কখন তার চাঁদ দেখা শেষ হবে, সে ঘরে ঢুকে নিজের কাজে অর্থাৎ গা পরিষ্কারে মন দিলে মা আবার দরজা বন্ধ ক'রে শুতে যাবে। সেই পুষ্প একটি পুত্রসন্তান রেখে মায়ের ওপরে অভিমান ক'রে এ বাড়ী ছেড়ে চ'লে গিয়েছিল। সে তার ছেলে মুনুকে সেদিন খুব ঠ্যাঙাচ্ছিল—রাতে, আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পর। মা বললে,

'পুষ্প ! খবরদার মারবে না ওকে !'
পুষ্প রেগে ফ্যাঁচ ক'রে উঠল ।
মা বললে, 'কি ! তুমি আমারই খাও, আমারই পর, আবার আমাকেই ফ্যাঁচ কর ! বেরিয়ে যাও !' আমরা সবাই সেখানে তখন দাঁড়িয়ে । পুষ্প একবার মুখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল তারপর তক্ষুনি জানালা দিয়ে লাফ মেরে কোথায় মিলিয়ে গেল অন্ধকারে । আর আসেনি ফিরে !
সেই ভয়ে মা, পুষ্পর ছেলে মুনুকে, যতই অন্যায় করুক সে, তাকে কক্ষনো **'বেরিয়ে যাও'** বলতো না ।
মুনুর গুণপনা নিয়ে মায়ের খুব গর্ব ছিল । সবার কাছে গপ্পো করত— মুনু কেমন ক'রে গা চেটে দেয়, মুনু কেমন ক'রে লেজ এবং পিছনের পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হ'য়ে সামনের থাবা দুটো দিয়ে কড়া নাড়ে ('ঠিক মানুষের মত !'), মায়ের জ্বর হ'লে মুনু কেমন যত্ন ক'রে থাবা দিয়ে পা টিপে দেয় ! মায়ের এই গর্বের কাহিনী শুনে অনেকেই মজা পেত । পুষ্প, মুনু—এরা দুজনেই মায়ের কাছে ছিল নাটকের প্রয়োজনে । 'গণ্ডার' নাটকে একটা বেড়ালের প্রয়োজন হ'তো !
মুনুকে নিয়ে মায়ের অনেক মজার মজার গল্প আছে ।
একদিন মা খুব পরিশ্রান্ত হ'য়ে ফিরেছে । আমি এবং মেরী (মায়ের পালিতা কন্যা বলা চলে) মায়ের পরিচর্যা করছি—মা খাটের ওপরে পা ছড়িয়ে ব'সে । মেরী মায়ের চুল বেঁধে দিচ্ছে, আমি পা টিপে দিচ্ছি, মুনু অদূরে মেঝের ওপরে ব'সে গা চাটছে । মায়ের মুনুর দিকে নজর প'ড়ল । আর সঙ্গে সঙ্গে মনে প'ড়ে গেল, মা যখন একটু আগে বাড়ী ফেরবার সময়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল মুনু দরজা খোলা পেয়ে একটু পালাবার চেষ্টায় ছিল । (মুনু মাঝে মাঝে অভিসারে বেরোত তো !) মা বলছিল, —'জানিস তো, মুনু চ'লে যাচ্ছিল, দেখি সুড় সুড় ক'রে নেমে যাচ্ছে । আমি বললাম—মুনু, যদি এ বাড়ীতে থাকতে হয় আমার সঙ্গে চ'লে এসো । শুনল না । আমি আবার বললাম, —মুনু ! যদি থাকতে হয় এখানে শীগ্‌গির আমার সঙ্গে চ'লে এসো ! তাও শুনছে না ! আমি বললাম—মুনু, —' বলতে বলতে মায়ের লক্ষ্য হ'য়েছে আমি আর মেরী ঠোঁট টিপে হাসছি । মা তৎক্ষণাৎ মুনুর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল,—
'সত্যি বলছি ! ওকে (মুনুকে) জিজ্ঞেস কর্ ।'
এরপর আমাদের গড়াগড়ি খেয়ে হা হা হাসি ঠেকায় কে ! আর মায়ের মুখে ঠিক সেইরকম হাসি !

রমা, মানে রমাপ্রসাদ বণিক, তখন ছোট ছিল—মাকে খুব খ্যাপাত, প্রতিদিনই প্রায় । ও খুব ছোট্টবেলায় 'পুতুলখেলা' নাটকে মায়ের ছেলের পার্ট করতে এসেছিল । আর ওর বাড়ীও ছিল আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি । ফলে ও খুব ঘনিষ্ঠ ছিল আমাদের । ওর বড় হবার সময়টায় । আমার পষ্ট মনে পড়ে হাউসকোট পরা মা চুলের বোঝা পিঠে নিয়ে, হাতে চিরুনী নিয়ে রমার পিছনে দৌড়ে বেড়াচ্ছে রমাকে মারবে ব'লে, —'দাঁড়া ! দেখাচ্ছি মজা ! বড় দুষ্টু হ'য়েছ তুমি, না ?'

মা-বাবা-আমি একদিন একসঙ্গে কোথাও বেরিয়েছি। তারপর কোয়ালিটিতে কফি খেতে গিয়েছি। বাবা বললে,— 'আমি কোল্ড কফি উইথ আইসক্রীম খাব।'
আমি বললুম,—
'আমিও'।
মা মুখটাকে কেমন ক'রে বললে,
'এ মা গো! কফি আবার কেউ ঠাণ্ডা খায়!'
আমরা তো খুব হাসলুম।
তারপর আমাদের দুজনের কোল্ড কফি সম্পর্কে উৎসাহ দেখে আরেকদিন মা বললে,-
'দেখি তো কোল্ড কফি কেমন?'
মায়ের জন্যেও নেওয়া হ'লো। এটা '৭০-সালের কথা। মা মুখে দিয়েই বললে,
'এমা! বিড়ি বিড়ি গন্ধ!'

মায়ের এই যেমন একটা দিক ছিল তেমনি আরেকটা দিক ছিল যেটা একেবারে অন্যরকম। যে দিকটার জন্যে সতেরো বছর বয়স থেকে মা নিজের ভাইবোনদের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে পেরেছিল, অর্থনৈতিক বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ঐভাবে থিয়েটার করবে ব'লে লেগে পড়েছিল, কিছু না মেনে। বস্তি থেকে ছেলে মেয়ে এনে মানুষ করেছিল। একটা অসম্ভব জেদ ছিল।
খুবই আর্থিক অসুবিধার মধ্যে বোনেদের লেখাপড়া শিখিয়েছে। নাসিরুদ্দিন রোডের বাড়ীতে আমার দুই মাসী থাকতেন। অনেকটা সময় আমার দিদিমাও থেকেছেন সেখানে। মায়ের কাছে শুনেছি বাবা এ ব্যাপারে সে সময়ে সবসময়েই সাথ দিয়েছিল। এবং মা নিজের শাশুড়ীর কিছু গয়না পেয়েছিল, তার সবগুলোই এইসময়ে বিক্রী হ'য়ে গিয়েছিল, একটিও বাকি থাকেনি। আমার কাছে ঠাকুমার স্মৃতি বলতে কিছু চিঠি ছাড়া কিছুই নেই। এতর পরেও মা আমাদের পাড়ার সোবিয়াবুবুর ছেলে সোহ্‌রাবকে মানুষ করবার দায়িত্ব নিল। সোহ্‌রাব আমার থেকে বছর তিনেকের ছোট হবে। সোহ্‌রাবকে নিয়েও বাড়ীতে খুব মজার মজার গল্প তৈরী হ'য়েছিল। সোহ্‌রাবের পড়াশোনা—আমাদের সবার যথেষ্ট উৎসাহ সত্ত্বেও— বশী এগোল না। ক্লাস সিক্স সেভেন পর্য্যন্ত প'ড়েছিল। ক্রমশঃ ওর অন্যসব দিকে মন চ'লে গেল। একসময়ে ওকে চ'লে যেতে হ'লো।

এর পরে সোহ্‌রাবেরই ছোট বোন মেরী—আসলে মেরিনাবিবি—মানুষ হ'তে এল। তাকেও ইস্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিল মা। মেরীরও কিন্তু ক্লাস সেভেনের বেশী পড়া হ'লো না। আমার মতই মেরীর খুব অসুখ করত। মা সমস্তরকম চিকিৎসার দায়িত্ব নিত। কোনো অবহেলা হ'তো না।
মেরী ব্যাকস্টেজের কাজ শিখেছিল নিপুণভাবে। মেক্‌-আপের সময়ে সাহায্য

করা, ২০ সেকেন্ডে কাপড় বদল ক'রে দেওয়া এ-সবে মেরীর জুড়ি ছিল না। 'বাকি ইতিহাস' নাটকে ঐরকম ২০ কি ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে মায়ের কাপড় বদল করা, দুল পরানো, চশমা খুলে নেওয়া বা পরে পরিয়ে দেওয়া এবং চুলের স্টাইল পাল্টে দেওয়া মেরী অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সম্পন্ন করত। তাই মেরী ছিল মায়ের ডানহাত। সব ব্যাপারেই মেরী ছাড়া উদ্ধারের সম্ভাবনা নেই। মেরীর বিয়ে হ'য়ে যাওয়াতে মা একটু মুশকিলে প'ড়ে গিয়েছিল। তবে মেরী কাছেই থাকত। সময়ে অসময়ে ডাক দিলেই আসত। একেবারে শেষ পর্য্যন্ত মায়ের মেরীর প্রতি অসম্ভব টান ছিল।

মাকে অনেকেই বলত কেন এইসব ছেলেমেয়েকে মা এত আস্কারা দেয়, তার ওপরে মুসলমান। আমাদের শিক্ষিত সংস্কৃতিবান খোলসের মধ্যে কোথায় এইসব কুসংস্কার র'য়ে যায়। এইসব বললে মা প্রথমতঃ অবাক হ'ত, তারপরে মায়ের জেদ আরো বেড়ে যেত।

মা যাবার আগে মেরীকে বেশ কিছু টাকা দিয়ে গেছে।

মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক ব'লে একটি চিকিৎসাকেন্দ্রে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার সুবিধার জন্য দশহাজার টাকা দিয়ে গেছে। আরো দশহাজার টাকার ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেটে নমিনি ছিল রামকৃষ্ণ মিশন। সে টাকাও তাঁরা পেয়ে গেছেন।

এ ছাড়াও মা যে কতরকম ভাবে কত গরীবের উপকার করেছে তার ঠিক নেই। নাসিরুদ্দিন রোডে ২৪শে মে ১৯৮৯-তে মাকে দেখবার জন্য সেইরকমই কত লোক ছুটে এসেছিল।

মৃত্যুর দিন পনেরো/ কুড়ি আগে মা সোহ্রাবকে ডেকে নিজের টিসট ঘড়িটা দিল, সোহরাবের মেয়ের মুখ দেখে টাকা দিল। মেরী, মেরীর বোনঝি বুড়ী (শেষের দিকে সে থাকত মায়ের কাছে) তাদের সামান্য উপহার দিল। উপহার দিল চৈতীকেও। চৈতী ঘোষাল। যে ডাকঘরে অমল করার সূত্রে আমাদের বাড়ীতে বেশীরভাগ সময়টা থাকত। সামান্য সোনার জিনিষ। মায়ের মুখে সেদিন একটা তৃপ্তি দেখেছিলুম। আর সবাইকে খবর দিয়ে জড়ো ক'রে মাকে সেই তৃপ্তিটুকু দিতে পেরে জীবনের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলুম।

বাবা-মায়ের বিয়ে হ'য়েছিল ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫ সালে। বোম্বাইতে। খাজা আহ্‌মেদ আব্বাস সাহেবের বাড়ীতে। সে বিয়ে ছিল অন্যরকম। বাবা-মায়ের কাছে গল্প শুনেছি। যতবার শুনেছি ততবারই মজা লেগেছে। আব্বাস সাহেবের বাড়ীর নাম ছিল 'সমুদ্র-তরঙ্গ'। আব্বাস সাহেবের স্ত্রী মুঝ্‌ঝি, শ্যালিকা ছাদি (এঁদের কত গল্পই কতবার মায়ের কাছে শুনেছি) বিরিয়ানি রান্না করেছিলেন। তখন কম্যুনিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি পি সি যোশী এসেছিলেন। মামা ফনসলকর বলেছিলেন Make it a grand IPTA event। অবশ্য grand কিছু করা হয়নি। মামা ফনসল্‌কর সম্ভবত IPTA-র মারাঠী ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ছিলেন এন এম যোশী, AITUC-র প্রেসিডেন্ট। তিনি বোধহয় কর্ত্তা

ছিলেন। মা বলত 'কন্যাকর্ত্তা হ'লেন মামুজান!' মামুজান ছিলেন আব্বাসের শ্বশুর। এবং মামাও বটে। সবাই তাঁকে মামুজান বলত। বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন—ভবানী সেন, বি টি রনদিভে, সোমনাথ লাহিড়ী, হামীদ বাট, বলরাজ সাহানি, শান্তি বর্দ্ধন, বাহাদুর খান—এইরকমই কতিপয় লোকজন। জনা ষোলোর বেশী বোধহয় নয়। দস্তরখান বিছিয়ে ইসলামি কায়দায় বিরিয়ানি খাওয়া হ'য়েছিল।

এইভাবে সমাজকে তোয়াক্কা না ক'রে তাদের বিয়ে, সমাজকে তোয়াক্কা না ক'রে তাদের বাঁচা। মা কোনোদিন সিঁদুর পরেনি, লোহা পরেনি, প্রচলিত নিয়মে চলেনি, প্রচলিত নিয়মে সংসার করেনি। পঁচিশ বছর একত্রে সংসার করেছে। তারপর '৭১ সালে বাবা আলাদা বাড়ীতে চ'লে গেছে। তার মধ্যে অনেক ঘটনা, অনেক জটিলতা নিশ্চয়ই ছিল। তার সবটা কেউই জানে না। দুটো মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কটা একান্তই তাদের নিজের। এই দুটো আলাদা বাড়ীতে থাকার কারণে এবং আরও নানান কারণে নানান কথা আলোচিত হ'য়েছে, এখনও বোধহয় হয়। অনেকে, যারা ভীষণ ভালোবাসত দুজনকেই, তারা আঘাত পেয়েছে। আমারও তো অনেক সময়ে মনে হ'য়েছে সবাই একসঙ্গে থাকতে পারলে কি ভালো হ'তো! কিন্তু সব ভালো পৃথিবীতে তো হয় না!

আর তাছাড়া আমার এটাও মনে আছে—আমাদের বাড়ীর সামনে কালীপুজোর মাইক বাজবে, আমার শরীর ভালো নয়— সবাই মিলে চ'লে গেলাম ৯৬, পার্কস্ট্রীটের পাঁচতলায়, বাবার ফ্ল্যাটে। দু'তিনদিন ওখানে বেশ রান্না-খাওয়া হ'লো। মা-ই রাঁধল। মায়ের রান্না খেতে বাবা খুব ভালোবাসত। এমনও মনে আছে—বাবা নাসিরুদ্দিন রোডের বাড়ীতে এসেছে। মা তখন কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চ থেকে 'সওদাগর' অভিনয় ক'রে ফিরল। সেদিন আমি রান্নাবান্না করেছি। বেশ একসঙ্গে খাওয়া হ'লো রাত্তিরে। বা কোনোদিন হয়তো মা-বাবা, কাকামণি-কাকিমা আমি সবাই মিলে চিড়িয়াখানায় গিয়েছি, বেড়িয়েছি, চীনে খাবার খেয়েছি, একসঙ্গে নাসিরুদ্দিন রোড়ে ফিরেছি।

এটাও সবাই জানে যে '৭৮ পর্য্যন্ত বাবা-মা নিয়মিত একসঙ্গে অভিনয় করেছে। '৮১ সালেও একসঙ্গে 'চার অধ্যায়'-এর দশটা অভিনয় করেছে।

ঐ বছরই বোধহয় মায়ের একবার খুব জ্বর হ'লো। আমি গিয়ে থাকলাম মায়ের কাছে। বাবা রোজই আসত দেখতে। আবার '৮২ সালে বাবার হঠাৎ ম্যালেরিয়া হ'লো, প্রবল আক্রমণ। আমি গেলাম, বাবার নিষেধ অমান্য ক'রে, জোর ক'রে থাকলাম, মা দেখে গেল। তার পরদিনই হঠাৎ আমাকে বম্বেতে যেতে হ'লো কাজে। হঠাৎই। আমার অস্বস্তি হ'চ্ছে বাবাকে ঐ অবস্থায় রেখে যেতে। মা বলল, 'বাবার জন্যে কিচ্ছু ভাবতে হবে না, তুমি কাজ ক'রে এস।'

এদের বাঁচার হিসেবটাই ভিন্ন ছিল। আমাদের মধ্যবিত্তসুলভ নিয়মের হিসেবে এদের বিচার না-করাই বোধহয় ঠিক। সব ভালো পৃথিবীতে হয় না এটা আমাদের মেনে নিতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত যখন সত্যিই মা এতটা অসুস্থ হ'য়ে পড়ল তখন বাবা যে এতটা দায়িত্ব নিয়েছে সেটাও মেনে নিতে হয়। বাকি কথার সবটা তো কেউই জানে না। খানিকটা হয়তো আমি অনুভব ক'রি।

কিন্তু এইসবই কি আলোচনা করার বিষয় এখন ?

আমি যখন খুব ছোট, ছেঁড়াতারে বসির করতে গিয়ে খুব কাঁদছি। (দুর্ভিক্ষের দৃশ্যের হাহাকার শুনলেই আমার কান্না পেত, আর কান্না পেলেই দর্শকের কাছ থেকে মুখটা লুকিয়ে ফেলার একটা প্রবণতা হ'তো। মা বলত, 'যত খুশী কাঁদো, মুখটা ঢেকে কেঁদো না।') মঞ্চে একটা দৃশ্যে 'মাও রে !' ব'লে মাকে জড়িয়ে ধ'রে সত্যিই খুব কাঁদছি, মা তখন আদর করতে করতে কানের কাছে মুখটা নিয়ে ফিস ফিস ক'রে বললে, 'ওরে, এত কাঁদিসনি !' এটা প্রায়ই হ'তো।

একবার, তখন আমি আরো ছোট, খুব জ্বর হ'য়েছিল আমার। মা একটু বেশী গরম দুধ মুখে দিয়ে ফেলেছিল, আমার জিভটা পুড়ে গিয়েছিল। অনুশোচনায়, দুঃখে মা কিভাবে কেঁদে উঠেছিল সে আমার এখনো পষ্ট মনে পড়ে। আমি তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলবার চেষ্টা করছিলুম আমার একটুও লাগেনি—সেও মনে পড়ে।

ভগবানের বিশেষ করুণায় অসুখ তো খুবই করেছে আমার ! আর মাকে বাবাকে তাই নিয়ে ভুগতেও হ'য়েছে। রাত জেগেছে দুজনে পালা ক'রে। কখনো আমার কাকা—কাকামণিও রাত জেগেছে এসে।

পরে যখন মা 'সেতু' করছে আমার পক্স হ'লো। বাবা ঢুকতে দিত না মাকে আমার ঘরে—পাছে মায়ের হ'য়ে যায়—অত শো তখন ! বাবা ঢুকত, লক্ষ্মীমাসী ঢুকত (লক্ষ্মীমাসী আমাকে সাত/ আট বছর বয়স থেকে প্রায় মানুষ করেছিল। লক্ষ্মীমাসী মারা গেছে—এ খবর হঠাৎই পেয়েছিলাম—অনেকদিন বাদে—মা যখন বেলভিউতে-)।

এমনও হ'য়েছে আমার বেশ ছোটবেলাতে, মা-বাবা থিয়েটার করতে চ'লে গেছে, আমার জ্বর। নিজেই টেম্পারেচার দেখেছি, প্রয়োজনে নিজে নিজে জলপটি দিয়েছি, আবার জ্বর দেখে জলপটি দেওয়া বন্ধ করেছি। এইরকম আরো অনেক কাজ যখন নিজে নিজে করতাম আমার সমবয়সী বন্ধুরা খুব অবাক হ'তো, —'সে কি রে !' আর আমার খুব গর্ব হ'তো। আমি কেমন নিজে নিজে এইসব পারি, ওরা পারে না ! কখনো কিন্তু মনে হয়নি মা আমার অনাদর ক'রল। আমাদের বাড়ীর আবহাওয়াটা ঐভাবেই তৈরী হ'য়েছিল—প্রথমে থিয়েটার তারপর সব কিছু।

এমনকি একটু বড় হ'য়ে, আমার চোখে সিস্ট্ হ'য়েছিল, সে কাটাতে গিয়েছি একাই। তারপর এক চোখে এক ঢাউস ব্যাণ্ডেজ নিয়ে একটা রিক্সা ডাকিয়ে টুক টুক ক'রে বাড়ী চ'লে এসেছি।

একটা পরিবারের সবাই যদি কোনো একটা কাজ করবে ব'লে এতটাই মন তাতে দিয়ে ফেলে তখন সেই সবক'টা মানুষকেই একটা জায়গায় একা হ'য়ে যেতে হয়। এবং সেই একাকিত্বকে স্বীকার ক'রেই তাকে বাঁচতে হয়, কাজ করতে হয়। এ আমি আমার জীবনে বার বার দেখেছি।

'৭৭ সালে আমার বিয়ে হ'য়ে গেল। আমি অন্যবাড়ীতে গেলুম। তখনও তো মেরী মায়ের কাছেই থাকে। চৈতী প্রায়ই ও বাড়ীতে এসে থাকত। তারপর '৮১ সালে মেরীর বিয়ে হ'য়ে গেল।
ও বাড়ীতে যখন সবাই আমরা জুটতাম, মায়ের সব কন্যেরা—আমি, মেরী, বুজু (আমার যে বোনের কথা প্রথমে বলেছি, মা চ'লে যাওয়াতে সে বেচারী এবার দ্বিতীয়বার মাতৃহারা হ'লো), চৈতী— তখন সে বেশ মজা হ'তো।

কিন্তু এর মধ্যে পরিস্থিতি একটু জটিল হ'য়েছে। '৭৯-তে আমি বহুরূপী ছাড়তে বাধ্য হ'লুম। আমি আমাদের চারজনের মধ্যে প্রথম বহুরূপী ছাড়লুম। তারপর ক্রমশঃ বাবা ছাড়ল, মা ছাড়ল এবং শেষ পর্য্যন্ত আমার স্বামীও। সবাই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারে। কিন্তু মূলে একটা বড় মিল ছিল—এখন আমার সেইরকমই মনে হয়। মা-ও বাধ্য হ'য়েছিল ছাড়তে। আমরা সবাই-ই বাধ্য হ'য়েছিলুম ছাড়তে। এর চেয়ে বেশী বলবার ইচ্ছে নেই। তবে এটা সত্য।

বহুরূপী ছাড়বার পরে মা থিয়েটার ক'রে যাবার চেষ্টা করেছে। আর আমি তখন অন্য কাজ করছিলুম। আমার ভালো লাগছিল না থিয়েটার করতে। থিয়েটার করছিলুম না বটে, কিন্তু খুব ব্যস্ত ছিলুম। উপার্জন করবারও প্রয়োজন ছিল।

এর পর '৮৩ তে লেখা হ'লো এবং মঞ্চস্থ হ'লো 'নাথবতী অনাথবৎ'। এই নাটকটি করার প্রয়োজনেই তৈরী হ'লো পঞ্চম বৈদিক সংস্থা। মা পঞ্চম বৈদিকের ফাউণ্ডার মেম্বার। আমাদের পঞ্চমবেদ চর্যাশ্রমের প্রথম বছরে মা নিয়মিত ক্লাস নিয়েছে, পরীক্ষা নিয়েছে। আরব্ধ নাট্যবিদ্যালয় তৈরী হওয়ার ফলে ক্রমশঃ মা তাই নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছে। শরীরও খারাপ হ'চ্ছিল ক্রমশঃ।

নতুন নাটকের মহলা পড়লে মা ভীষণ খাটতে পারত, আনন্দ ক'রে খাটত।
'বাকি ইতিহাস'-এর মহলার সময়ে বাবা এই সেদিন গল্প ক'রে বলল,
—'সারাদিন মহলা চলছিল, সকাল থেকে। রাত ৯॥টা নাগাদ বোধহয় কুমার শুয়ে প'ড়ল। তোর মা তখনো দাঁড়িয়ে—'
আমার মনে প'ড়ল সেই সময়টায় আমি শয্যাশায়ী। যতদূর মনে পড়ে বাড়ীতে ভালো কাজের লোকও ছিল না।
যখন সেতু চলছিল সেইসময়ে তো বেশীরভাগ রবিবার সকালে নিউ এম্পায়ারে বহুরূপীর শো থাকত—এ ছাড়া তো বহুরূপী কোথাও মঞ্চ পেত না। সুতরাং রবিবারগুলোতে মাকে তিনটে শো করতে হ'তো। এবং বোধহয় '৬১ সালে কিছুদিন বিশ্বরূপাতে মঙ্গলবারগুলো বহুরূপী পেয়েছিল। কাজেই সপ্তাহে কমপক্ষে মাকে তখন ছ-টা শো করতে হ'তো। ছুটি থাকলে আরো বেশী। সোম, বুধ, শুক্র প্রাণপণে মহলা দিতে হ'তো বহুরূপীতে। এর মধ্যে আবার

শ্যুটিং-ও পড়ত। মায়ের সঙ্গে প্রায় দেখাই হ'তো না আমার।

১৯২৫-র সেপ্টেম্বরের একেবারে শেষে আমরা বাড়ী বদল ক'রে পার্কসার্কাস থেকে বকুলবাগানের বাড়ীতে এলুম। তার কয়েকদিনের মধ্যেই মাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসতে হ'লো—মায়ের হাতে পায়ে ব্যথা, দুর্বলতা, কিছুটা রক্তশূন্যতা। কিছুদিন সেখানে থেকে মা একটু জোর ক'রেই নাসিরুদ্দিন রোডের বাড়ীতে ফিরে গেল, ২৫ শে অক্টোবর একাডেমিতে 'অপরাজিতা'-র অভিনয় আছে ব'লে। বললে, 'ওখান থেকেই করতে সুবিধা হবে, আমি চ'লে যাই।' ২৪ শে সকালে পা পিছলে প'ড়ে গেল ও-বাড়ীর প্যাসেজে। ব্যথা প্রচণ্ড বাড়ল। আরো অঘটন ঘটতে পারত তখুনি। বরাতক্রমে হয়নি। সেই প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে ২৫ শে অক্টোবর ১৯২৫-তে মায়ের শেষ মঞ্চে নামা। সেদিন মায়ের জন্মদিন ছিল। তখন কি জানি শেষ শো ব'লে?
নভেম্বরের গোড়ায় ভয়ঙ্কর রকমের কোলাইটিস। মনে আছে এক রাত্তিরে ঘন্টাখানেক কি দেড়েকের মধ্যে পাঁচটা ইঞ্জেকশন দিতে হ'য়েছিল। নিজের হাতে দিয়েছিলাম আমি।
কিঞ্চিৎ সুস্থ হ'য়ে ডিসেম্বর মাসে 'সরীসৃপ' অভিনয় করল দূরদর্শনে।
তখন আমরা শুনেছি ঐ নাম—'রিউমাটয়েড আথ্রাইটিস্।' মায়ের ডান হাত তখন অশক্ত।
ডাক্তারের পরামর্শে মাকে পিজি হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হ'লো। লাভ হ'লো না কিছুই। বরং আরো পঙ্গু হ'য়ে পড়তে লাগল।
একমাস রেখে নিয়ে এলাম আমার বাড়ীতে। পাঁচ মাস ছিল তখন। ক্রমশঃ চলাফেরার ক্ষমতা ফিরছিল। খেতে পারছিল। ফিজিওথেরাপি হ'তো নিয়মিত, বাড়ীতেই। প্রখ্যাত কবিরাজ শিবকালী ভট্টাচার্য্য একদিন দেখতে এলেন। তাঁর নির্দেশও পালন করা হ'চ্ছিল। হোমিওপ্যাথির একজন নামী চিকিৎসক ডাঃ কৃষ্ণণ—তিনিও ওষুধ দিচ্ছিলেন। ডাঃ কে. বি. রায় তো তখন থেকেই আমাদের সঙ্গে। তাঁর পরামর্শে অনেক সার্জনকেই দেখানো হ'চ্ছিল। মতামত নেওয়া হ'চ্ছিল তাঁদের। যদিও তাঁরা বলেছিলেন এ রোগ সারবার নয়, তবুও চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এবং মা একটু একটু ক'রে সত্যিই ভালো হ'চ্ছিল। সকালে একজন সাহায্যকারিনীকে নিয়ে হেঁটে বেড়াতে বেরুতো, হেঁটে হেঁটে আমার ছোটমাসীর বাড়ীতে যেত। ট্যাক্সি ক'রে নাসিরুদ্দিন রোডেও যেত আরব্ধর ক্লাস নিতে। এমনি ভালো হ'য়ে উঠতে মা আবার ফিরে গেল নাসিরুদ্দিন রোডের বাড়ীতে, ১৮ই জুন, —আর জুলাই-এর গোড়াতে ধরা পড়ল ক্যানসার। পেটে। পাঁচ সপ্তাহ ধ'রে আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমে কিঞ্চিৎ উন্নতি হ'তে আগস্ট মাসে বেলভিউতে ভর্ত্তি হ'লো। সেই সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে চিকিৎসার আর্থিক দায়িত্ব নিলেন। এবং অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত তা বহন করেছিলেন।

মা আর নাসিরুদ্দিন রোডে ফিরতে পারেনি। একা রাখা অসম্ভব ব'লেই

মায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক হ'লো গোলপার্কে বাবার ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়া হবে মাকে। বাবাই প্রথমে সেটা বলে। কারণ বাবার ঐ ফ্ল্যাটে বাথরুমসহ শোবার ঘর আলাদা মায়ের জন্য ছেড়ে দেবার উপায় ছিল। যেটা তখন অত্যন্ত প্রয়োজন। এবং দ্বিতীয় প্রয়োজন ছিল বাড়ীতে সর্বসময়ে কেউ থাকা। বাবা বা আমি। সে যেখানেই হোক। এ দুটো সমস্যার সমাধান হয় ওখানে গেলে। মা-ও খুশী হ'য়েই গেল। কিন্তু নিজের সংসার নাসিরুদ্দিন রোডের জন্য মায়ের মন কেমন করত।
—'একবারটি নিয়ে যাবি ?'
—'আর একটু ভালো হও। নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।'
মনে মনে ভেবেছিলাম সপ্তাহখানেক নিজের কাজকর্ম বাতিল ক'রে সাতদিন ওখানে থাকার বন্দোবস্ত ক'রে মাকে নিয়ে ওখানে থাকব। তারপর ফের ফিরিয়ে আনা যাবে গোলপার্কে। আমি মাঝে মাঝেই নাসিরুদ্দিন রোডের বাড়ীটা পরিষ্কার করাতে যেতাম। আর সবই ঠিক ছিল, খালি মায়ের বারান্দার গাছগুলো সব ম'রে গিয়েছিল।

কিন্তু আর একটু ভালো হওয়া আর মায়ের হ'লো না।

২রা মে-তে মধ্যপ্রদেশ সরকারের প্রতিনিধি অশোক বাজপেয়ী গোলপার্কের বাড়ীতে কালিদাস সম্মানের ফলক এবং চেক নিয়ে এলেন। শ্রীমৃণালসেন তা হাতে তুলে দেবেন মায়ের। রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ছিলেন ব্যবস্থাপক। তখন আমরা যথাসম্ভব সাজালুম ঘরটাকে। মায়ের অসুখ ঐ ক'দিনেই খুব বেড়ে গেছে। খুব যন্ত্রণা। তাই নিয়ে নিজের পছন্দমতন সাজল। আমাকে নির্দেশ দিল। আমি সাজিয়ে দিলুম। সঙ্গে সেদিন মেরী ছিল, আর তখন দিনের বেলায় যে সিস্টার থাকত, সীমা। একটা হুইল চেয়ার আনা হ'য়েছিল। যে কোনো সময়ে যা কিছু ঘটতে পারে এই জ্ঞান বহন করছিলুম আমরা। মাকে নিয়ে যাওয়া হ'লো বসবার ঘরে। মায়ের তাই-ই ইচ্ছে ছিল। সেখানে ছবি তোলা হ'লো। খুব সামান্য লোকের সামনে অনাড়ম্বর ভাবে অনুষ্ঠান হ'য়ে গেল। বাইরে প্রেসের লোকের ভীড়। তাঁরা খুবই ক্রুদ্ধ হ'য়েছিলেন আমাদের ওপরে সেদিন। কিন্তু সেদিন তাঁদের ব্যাখ্যা ক'রে বলবার উপায় ছিল না অবস্থাটা কি ! কেন তাঁদের মায়ের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া যাবে না ! নিরুপায় হ'য়ে তাঁদের ক্রোধ সহ্য করতে হ'য়েছে সেদিন। বলা যায়নি সর্বসমক্ষে যে ঐটুকু ধকলেই মা কত কাহিল হ'য়ে পড়েছিল। এবং ঘরে ফেরার আধঘন্টার মধ্যে অক্সিজেন চালু করতে হ'য়েছিল, যা বহাল ছিল শেষ পর্য্যন্ত।
সেদিন মা কিন্তু বসবার ঘরে উজ্জ্বল হ'য়ে ছিল। কেউ বুঝতে পারবে না দেখে কি ব্যাধি, কত পরিমাণ কষ্ট মা বহন করছিল তখন। মায়ের ঘরে ফিরে মাকে বললুম—
—'মা, একটুও বোঝা যাচ্ছিল না গো যে তোমার আদৌ কোনো অসুখ

হ'য়েছে !'
মা উত্তর করলে,—
—'এই জিনিষটাই তো আমাদের (অভিনেতা-অভিনেত্রীর) সর্বপ্রথম শিখতে হয় !'

কোমার মধ্যে থাকাকালীন মাঝে মাঝে মনে হ'তো জ্ঞান ফিরেছে, একটু বুঝতে পারছে। কথা বলতে চাইত। কিন্তু কথা এত জ'ড়িয়ে যেত যে কিচ্ছু বুঝতে পারা যেত না।

একদিন দুপুরে, সম্ভবতঃ সেটা ১৮ তারিখ, হঠাৎ তাকিয়ে হাসল। কি বলছিল যেন ! কান পেতে শুনি,
—'নাটকটা বেশ ভালো।'
—'কি নাটক মা ?'
—'ঐ যে নাটকটা, ওরা করল !'
—'কি নাটক ? কারা করল ? তুমি দেখলে বুঝি ?'
বললে,— 'হ্যাঁ !' কি তৃপ্তির হাসি মুখে ! বললে,
—'কার বুদ্ধি জানি না তবে যে করেছে বেশ ভালো করেছে। এটা ঠিকমত করতে পারলে—ভালো হ'তে পারে !
—'কি নাটক ?'
আমি তখন অধীর। কি নাটক নিয়ে মা ভাবছে এই সময়ে ! কি নাটক সেটা ? গভীর অচেতনতার মাঝে কোন নাটক দেখছিল মা ? কি দেখে অমন পরিতৃপ্তির হাসি ?
—'কি নাটক ? কারা করল ? মা ?'
—'আমি তো সব গুছিয়ে বলতে পারব না আর ! তবে বেশ ভালো !'
ব'লে কি একটা ইংরিজি নাম উচ্চারণ করবার চেষ্টা করল, বিশেষ বোঝা গেল না। এবং তারপরই ডুবে গেল কোথায় ! নিঃসাড় !
এইটাই মায়ের সঙ্গে আমার শেষ কথোপকথন।

যম মরিয়া হ'য়ে শেষ লড়াইটা শুরু করল ২৩ শে মে দুপুর থেকে। তার প্রতিটা আঁচড় যেন স্পষ্ট হ'য়ে উঠছিল, তার গর্জনও যেন শোনা যাচ্ছিল। অসম্ভব জ্বর। মুখটা শুকিয়ে ছোট্ট হ'য়ে গেছে। শেষ রাত্তিরটায় আমি আর রানীদি ছিলাম, আর সিসটার মিনতিদি। রানীদি আমাদের সহকর্মিনী। যাঁর আসল নাম 'তৃপ্তি মিত্র'। অসুবিধা হবে এতে নানানকারণে, তাই মা-ই তার নাম দিয়েছিল রানী। সে ৭৭-৭৮ সালে, বহুরূপীতে। রানীদিই ছিল মায়ের কাছে শেষরাতটা। অসহায় আমরা মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে। বসবার ঘরে ডাঃ রায় এবং একজন জুনিয়র ডাক্তার এবং আমাদের অপর সহকর্মী রামাধী। গত ২২ শের রাতটাও মায়ের পাশে ছিলাম। কিন্তু সে-চেহারা আর পরের রাতের চেহারা—এ দুইয়ে যে কত যোজন তফাৎ ! সে অবিশ্বাস্য !

ডাক্তার বলছিল ব্যথা বোধ আর নেই। কি জানি। সম্পূর্ণ জ্ঞানহারা সেই মুখখানিতে কত যে কষ্টের ছাপ! কষ্ট পাওয়া সেই মুখখানি যে কেবলই আমার চোখের সামনে ভাসে। একটু জলও তো খাওয়ানো যায়নি শেষ চব্বিশ ঘন্টায়!

সকাল গড়িয়ে দুপুর হ'লো। আমি, বুজু, তিনজন ডাক্তার, সিসটার। বাইরে বসবার ঘরে তখন অনেক লোক। আমার দুই মাসী, এবং আমাদেরই সহকর্মী কিছু মানুষ—সাহায্য করবার জন্যে ছুটে এসেছেন। হঠাৎ মায়ের পা-টা গরম হ'য়েছে বোধ ক'রে আমি আশান্বিত হ'য়ে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়েছি, মা বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে, —আর তখনই ডাঃ রায়—

গরদের শাড়ী পরিয়ে মাকে কাঁচের গাড়ীতে ক'রে বাবার কাছ থেকে নাসিরুদ্দিন রোডের বাড়ীতে নিয়ে এলাম। মা ফিরতে চেয়েছিল।

বহু মানুষের ভীড় সেখানে। আত্মীয়, বন্ধু, সাংবাদিক, থিয়েটারের কর্মী, পরিচালক, সিনেমা, টেলিভিশন, রেডিও—কত লোক! কত কত লোক!

বাবা তখন একলাই ছিল গোলপার্কে। এই একলা থাকাটা বাবার পক্ষে খুব প্রয়োজন ছিল সেদিন।

মায়ের বেয়াল্লিশ বছরের সংসার থেকে কেমন সহজে মা চ'লে গেল। প্রথমে রবীন্দ্রসদনে, তারপর শেষ গন্তব্যস্থল অভিমুখে।

কাঁচের গাড়ীতে শোয়ানো মাকে দেখে মনে হ'চ্ছিল কোনকিছু থেকে মাকে বাঁচানোর আর কোনো দায়িত্ব রইল না আমার। এবারে মা একা একাই চ'লে যাবে যেখানে যাবার। আমার আর নাগাল পাবার সাধ্য নেই।

✸